Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা ফরহাদ সায়মা

রোলঃ 23090121721

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

হাজেরা ফরহাদ সায়মা

রোলঃ 23090121721

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে হাজেরা ফরহাদ সায়মা, আইডিঃ 23090121721 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে নারীদের অধিকার ও অবস্থান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sayma

(স্বাক্ষর)

হাজেরা ফরহাদ সায়মা

আইডিঃ 23090121721

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

❑ অধ্যায় - ০১ : নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য..5

❑ অধ্যায় - ০২ : ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারীর অবস্থান 8

❑ অধ্যায় - ০৩ : অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে নারীর অবস্থান..11

❑ অধ্যায় - ০৪ : কুরআনে নারীর মর্যাদা...14

❑ অধ্যায় - ০৫ : হাদীসে নারীর সম্মান...20

❑ অধ্যায় - ০৬ : নারীবাদ বনাম ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি 23

❑ অধ্যায় - ০৭ : কথিত নারীবাদের আড়ালে সমকামিতার ফাঁদ...................................29

❑ অধ্যায় - ০৮ : কথিত নারীবাদী ও ওরিয়েন্টালিস্টদের কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ : এবং ইসলামের জবাব...34

❑ অধ্যায় - ০৯ : ইসলামে বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বদের অবদান...47

❑ অধ্যায় - ১০ : ২১-শতকের মুসলিমাহ: হীনমন্যতা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জনের পথ .53

❑ অধ্যায় - ০১ : নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়ে মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন, বিশেষত নারী সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তার সম্মান ও তার ভূমিকার কোরআনিক ব্যাখ্যা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে—মানুষ সৃষ্টি ছিল আল্লাহর বিশেষ পরিকল্পনার ফল, যা ফেরেশতাদের বিস্ময় ও প্রশ্নের মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়। আদম (আ.)–এর সৃষ্টি, জান্নাতে তাঁর অবস্থান, একাকিত্ব এবং সেই একাকিত্ব পূরণের জন্য হাওয়া (আ.)–এর সৃষ্টির ঘটনা আলোচিত হয়েছে। কুরআনের আয়াতসমূহের আলোকে দেখানো হয়েছে—নারী কোনো গৌণ বা অপরিপূরক সত্তা নয়; বরং তিনি মানব জীবনের পূর্ণতা, মায়ার আধার এবং পরিবার ও সমাজ গঠনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। এই অধ্যায় নারীর সৃষ্টিতে নিহিত হিকমাহ, মর্যাদা এবং উম্মাহ গঠনে তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকা তুলে ধরেছে।

—

সৃষ্টি জগতের পুরো অংশ জুড়ে তখন জিন আর ফেরেশতাদের অবস্থান। মহান রবের প্রশংসায় তারা মুখরিত, সর্বদা নিজ স্রষ্টার ইবাদতে তারা নিমগ্ন। মানুষ নামক কোনো সৃষ্টি তখনো এই জগত অবলোকন করেনি।

তবে এই সৃষ্টি জগতের যিনি স্রষ্টা, তাঁর ছিল ভিন্ন এক পরিকল্পনা। আর নিশ্চয়ই তিনিই তো সর্বোত্তম পরিকল্পনাকারী। তিনি ইচ্ছা করলেন জিন ও ফেরেশতা ব্যতীত ভিন্ন এক মাখলুক সৃষ্টির। তবে কে জানত! ভিন্ন এই নতুন সৃষ্টি হয়ে উঠবে আশরাফুল মাখলুকাত — অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি।

একসময় ঘোষণা এলো মহান রাব্বুল আলামীনের :

“আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব ফেরেশতাদের বললেন, আমি অবশ্যই পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি সৃষ্টি করব।” [১]

ফেরেশতারা বিস্ময়ে বলল :

“হে আল্লাহ! আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে সেখানে ফিতনা ছড়াবে, রক্তপাত করবে? অথচ আমরা তো আপনার প্রশংসা করি, আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করি!”

আল্লাহ তাআলা বললেন :

“আমি সে বিষয়ে জানি যা তোমরা জানো না।” [২]

অতঃপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন এই সৃষ্টির প্রথম মানুষ, তাঁর প্রথম রাসূল, মানবজাতির আদি পিতা — হজরত আদম আ.-কে।

❑ জান্নাতে আদম আ.-এর একাকিত্ব :

আল্লাহ তাআলা আদম আ.-এর বসবাসের জন্য খুলে দিলেন তাঁর নিয়ামতে ভরপুর অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত চির প্রশান্তির জান্নাতের দরজা। আদম আ. জান্নাতে বসবাস শুরু করলেন। জান্নাতের অগণিত নেয়ামত, নদী-ঝরনা, ফল-মূল, সৌন্দর্য — সব তাঁর সামনে উপস্থিত। কিন্তু তবুও কোথাও যেন একটা শূন্যতা! এত পূর্ণতার মাঝেও কিছু একটার অপূর্ণতা!

এর কারণ হয়তো মানুষের ফিতরত— মানুষ একা পূর্ণ হয় না। সে কারো সঙ্গ, কারো মায়া, কারো ভালোবাসার প্রয়োজন বোধ করে।

আর যিনি স্রষ্টা তিনিই তো তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সবচেয়ে অধিক অবগত। আল্লাহ তাআলা আদম আ.-এর এই শূন্যতা পূরণ করলেন এই সৃষ্টি জগতের প্রথম নারী সৃষ্টির মাধ্যমে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন :

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক প্রাণ থেকে, আর সেখান থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জুটি, আর উভয়ের থেকে বিস্তার করেছেন বহু পুরুষ ও নারী।” [৩]

আদম আ. থেকেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন সৃষ্টি করলেন তাঁর জীবনসঙ্গিনী, তাঁর পূর্ণতাদানকারিণী — হজরত হাওয়া আ.-কে।

নারী — পূর্ণতা দানকারী

প্রিয় পাঠক, একটু সময় নিন। একটু স্থির হয়ে হাওয়া আ.-এর সৃষ্টির গভীর হিকমা নিয়ে ভাবুন। হাওয়া আ. কোনো তুচ্ছ সৃষ্টি নন, তিনি নন কোনো পার্শ্বচরিত্র — বরং তিনি আদম আ.-এর পূর্ণতা দানকারিণী।

আদম আ.-এর জীবন জান্নাতের নেয়ামতে ছিল ভরপুর, কিন্তু তাঁর এই জীবনে পূর্ণতা এলো হাওয়া আ.-এর আগমনে।

ঠিক তেমনি আজকের পৃথিবীতেও নারী হলো:
- পূর্ণতা দানকারী
- নারী মমতার আশ্রয়
- নারী পরিবার ও উম্মাহ গড়ার ভিত্তি

একজন নেককার নারী তাঁর ঘরের প্রশান্তি, সমাজের সৌন্দর্য, এবং এই উম্মাহর অর্ধেক শক্তি।

—

রেফারেন্স :

[১] সূরা বাকারা: ৩০
[২] সূরা বাকারা: ৩০
[৩] সূরা নিসা: ১

—

❑ অধ্যায় - ০২ : ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারীর অবস্থান

এই অধ্যায়ে ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে নারীর অবমাননা, অধিকারহীনতা এবং মানবিক মর্যাদাহীন অবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই ভয়াবহ অন্ধকার অবস্থা তুলে ধরার উদ্দেশ্য হলো—ইসলাম আগমনের পর নারীর মর্যাদা, অধিকার ও সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিপ্লবাত্মক ভূমিকা বুঝিয়ে দেওয়া। এটি পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ইসলামের দেয়া নারীর প্রকৃত মর্যাদা উপলব্ধির ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।

—

বর্তমানে আমরা অবস্থান করছি এমন এক ফিতনাময় সময়ে, যেখানে একদিকে সেক্যুলার ও ওরিয়েন্টালিস্টদের সূক্ষ্ম চক্রান্ত, অন্যদিকে নারীবাদের ভয়াল থাবায়—উম্মাহর নারীর অস্তিত্ব আজ গভীর সংকটে।

এই দু'দিকের আঘাতে মুসলিম নারী আজ ভুলে যাচ্ছে তার প্রকৃত পরিচয়, ভুলে যাচ্ছে ইসলাম তাকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।

তাই আজ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে — ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা, নিজেকে সেই মর্যাদার যোগ্য করে তোলা এবং ফিতনার এই স্রোতে নিজের অবস্থান বুঝে নেয়া।

কিন্তু, ইসলামে নারীকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে তা সত্যিকারে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের শুরুতেই একটি তুলনামূলক দৃষ্টি দিতে হবে —

- ইসলাম পূর্বে নারীর অবস্থা কেমন ছিল,
- অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে নারীর অবস্থান কেমন,
- আর ইসলাম আসার পর নারীরা কীভাবে নবজীবন ও প্রকৃত মর্যাদা পেল।

তাহলে চলুন, ফিরে যাই ১৪০০ বছর আগের ইসলাম-পূর্ব সেই আরব সমাজে, আর খুঁজে দেখি সেই সময় নারী জাতির ইতিহাস — যে ইতিহাস এক অন্ধকার অধ্যায়ে মোড়ানো ছিল, যেখান থেকে ইসলাম এসে নারীর জন্য আলো, অধিকার ও সম্মানের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

চারদিকে তখন ছিল জাহিলিয়াতের অন্ধকার। তাইতো ইসলামপূর্ব সে আরব সমাজকে আজও বলা হয় আইয়ামে জাহেলিয়াত। সেসময় মানবিকতা ছিল যেন পদদলিত—আর সেই অমানবিক অন্ধকারের সবচেয়ে নির্মম আঘাতটা পড়েছিল নারীর উপর।

ইসলাম আসার পূর্বে আরব সমাজে নারী বলতে বোঝাতো একটি বোঝা, এক লজ্জার কারণ, এক অবমাননাকর অস্তিত্ব। সমাজে তারা ছিল একেবারে অধিকারবঞ্চিত। সম্মান বা মর্যাদা—এই শব্দগুলো তাদের অভিধানে ছিলই না।

❑ জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটিতে পুঁতে ফেলা

যে মায়ের কোল সন্তান জন্ম দিয়ে ভরে ওঠার কথা, সেই মায়ের মুখে হতাশার ছায়া পড়ত যদি সন্তানটি মেয়ে হত।

আর তখনই শুরু হতো সেই অমানবিক রীতি—জীবন্ত কন্যা সন্তানকে মাটিচাপা দেয়া!
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এই বর্বরতার দৃশ্যটি তুলে ধরেছেন—

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ
“আর যখন জীবন্ত কবর দেওয়া কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে—কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?” [১]

এ আয়াত যেন পুরো জাহিলিয়াত যুগের এক কালো প্রতিচ্ছবি।

❑ নারীর সম্পদ ও উত্তরাধিকারের অধিকার ছিল না

সে সমাজে নারী কখনোই উত্তরাধিকার পেত না।
পিতা মারা গেলে তার সম্পদের উত্তরাধিকার হতো কেবল পুরুষের। স্ত্রী, কন্যা, মা—কেউ কোনো সম্পদের দাবিদার ছিল না। বরং নারী নিজেই হতো উত্তরাধিকারের সম্পদ—অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর পুত্র নিজের সৎমাকেও উত্তরাধিকারের অংশ হিসেবে “পাওয়া” বৈধ মনে করত! [২]

❑ **নারীর বিয়ে ও সামাজিক অধিকার**

ইসলামপূর্ব সে আরব সমাজে নারীর সম্মতি ছাড়াই তাকে বিবাহে বাধ্য করা হতো। মোহর তার প্রাপ্য হলেও তা দখল করে নিত স্বামী। বিধবার পুনর্বিবাহ ছিল লজ্জাজনক অপরাধ হিসেবে গণ্য। নারী ছিল পুরুষের ভোগের বস্তু, এক অবহেলিত প্রাণ।

রাসূল ﷺ এর নবুয়তের পূর্বে মক্কার সমাজে প্রচলিত ছিল যে,
একজন পুরুষ যত খুশি নারীকে বিবাহ করে তাদের অধিকার পদদলিত করতে পারতো। তাদের খাওয়া, পোশাক এমনকি বেঁচে থাকার স্বাধীনতাতেও ছিল বৈষম্য।

ইবনু সা'দ ও তাবারীর বর্ণনায় পাওয়া যায়—কিছু খাদ্য কেবল পুরুষের জন্য নির্ধারিত ছিল, নারী তা ছুঁতেও পারত না।

ইমাম যাহাবী বলেন,
"ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীকে মানুষ হিসেবেও গণ্য করা হতো না। ইসলামই প্রথম তাকে মানবিক মর্যাদায় উন্নীত করেছে।" [৩]

এমনই এক নিষ্ঠুর, অধিকারহীন, বঞ্চিত সমাজে নারীর জন্য ইসলামের আগমন ঘটে আলো—জীবনের অধিকার, উত্তরাধিকার, সম্মানের অধিকার এবং জান্নাতের প্রতিশ্রুতি হয়ে।

—

রেফারেন্স :

[১] (সূরা আত-তাকউইর, আয়াত ৮–৯)
[২] (তাফসীর ইবন কাসির, সূরা নিসা ১৯ আয়াতের ব্যাখ্যা দেখুন)
[৩] (আল-কাবায়ের, যাহাবী)

—

❑ অধ্যায় - ০৩ : অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে নারীর অবস্থান

এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে—ইসলামের বাইরে বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদে নারীর বাস্তব অবস্থান কতটা সীমাবদ্ধ, অধিকারহীন ও বঞ্চিত ছিল; কোথাও নারীকে সম্পত্তি, কোথাও পাপের উৎস, আবার কোথাও শোষণের প্রতীক হিসেবে দেখা হতো। এই তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি পরবর্তী অধ্যায়ে ইসলামে নারীর মর্যাদা বোঝার জন্য একটি শক্তিশালী প্রেক্ষাপট তৈরি করে।

—

আজ আমরা যখন বলি, "ইসলাম নারীর সঠিক মর্যাদা দিয়েছে", তখন এটি শুধু কোনো আবেগময় দাবি নয়—এটি একটি চিরন্তন সত্য। এই সত্যের গভীরতা অনুধাবন করা যায় তখনই, যখন আমরা ইসলামের বাহিরে অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদে—নারীর করুণ অবস্থার দিকে একবার তাকাই।

ঘুরে দেখা যাক অন্যান্য কিছু ধর্ম ও মতবাদের দিকে-

❑ হিন্দু ধর্মে নারীর অবস্থান

হিন্দু শাস্ত্রে নারীকে "দেবী" বলা হলেও বাস্তবে নারীর অবস্থান সম্পর্কে তাদের ধর্মগ্রন্থে বলা হচ্ছে-

"স্ত্রী কখনো সম্পদের অধিকারী নয়।" [১]

অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে উত্তরাধিকার ও সম্পত্তির অধিকার থেকে নারীকে করা হয়েছে বঞ্চিত।

এছাড়াও পূর্ব যুগের হিন্দু ধর্মাবলম্বী নারীদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পারি সন্তানের মৃত্যু বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীর জীবন হয়ে যেত নিঃসঙ্গ দুঃখের প্রতিচ্ছবি — "সতীদাহ" প্রথা তার এক জঘন্য উদাহরণ। যেখানে স্বামীর চিতার আগুনেই স্ত্রীকে জীবন্ত পুড়ে মরতে হতো "ভক্তি"র নামে!

❑ খ্রীষ্ট ধর্মে নারীর অবস্থান

বাইবেলে আদম ও হাওয়ার কাহিনিতে নারীর প্রতি প্রথম অভিযোগ তোলা হয়—

“নারীর কারণে মানুষ স্বর্গ হারিয়েছে।” [৩]

এ ধারণা থেকেই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খ্রিস্টান সমাজে নারীকে পাপের উৎস ধরা হয়েছে।
ইউরোপীয় চার্চের ধর্মযাজকগণ একসময় প্রকাশ্যে বিতর্ক করেছিল—
“নারী কি আদৌ মানবজাতির অংশ?” [৪]

বিয়ের পর নারীর সম্পত্তি হতো স্বামীর মালিকানাধীন, এমনকি ১৮৮২ সালের আগে ইংল্যান্ডে কোনো নারী নিজ নামে সম্পত্তি রাখতে পারতেন না। [৫]

❑ ইহুদি ধর্মে নারীর অবস্থান

ইহুদি ধর্মে নারীর ভূমিকা খুবই সীমিত।

তালমুদে বলা হয়েছে—

“নারীর কণ্ঠ শোনা মানেই কামনাকে জাগানো।” [৬]

তারা বিশ্বাস করে, নারীই ছিল সেই সৃষ্টির কারণ যেজন্য মানুষ জান্নাত (Eden) থেকে বিতাড়িত হয়েছে।

ইহুদী আইন অনুযায়ী নারী পিতার সম্পত্তির অংশীদার নয়। [৭]

❑ পাশ্চাত্য সেকুলার সমাজে নারীর অবস্থান

আজ পাশ্চাত্য সেকুলার সমাজ নারী স্বাধীনতার গান গায়, আমাদের শেখায় নারী অধিকারের পাঠ, কিন্তু বাস্তবতা তার উল্টো। পশ্চিমা বিশ্বে নারীকে “স্বাধীনতা”র নামে ভোগ্যবস্তু হিসেবে শরীরের প্রদর্শনীতে পরিণত করা হয়েছে। বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকালেই দেখা যায় বর্তমান সময়ে ডিভোর্সের হার, ধর্ষণের হার, অবিবাহিত মাতৃত্ব—সবচেয়ে বেশি এই পশ্চিমা দেশ গুলোতে।

জাতিসংঘের (UN Women, 2023 report) মতে, প্রতি ৩ জন নারীর ১ জন জীবনে অন্তত একবার শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের শিকার।
এটাই হলো তাদের নারী স্বাধীনতার বাস্তব চেহারা।

রেফারেন্স :

[১] (Manusmriti IX:416)
[২] (Genesis 3:16–17)
[৩] (Ref: “The Medieval Debate on Women’s Nature”, Joan Cadden, Speculum Journal, 1983)
[৪] (Ref: Married Women’s Property Act, 1882)
[৫] (Talmud, Berachot 24a)
[৬] (Numbers 27:1–11, Torah অনুযায়ী শুধুমাত্র পুত্রগণ উত্তরাধিকার পায়)।

—

❑ অধ্যায় - ০৪ : কুরআনে নারীর মর্যাদা

মানবজাতির জন্য আল-কুরআন হলো সর্বোচ্চ দিকনির্দেশনা ও আলোকবর্তিকা। এটি কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং এটি মানুষের জীবনধারা, চিন্তা, নৈতিকতা ও সমাজব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা।

বর্তমান সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে নানা ভুল ধারণা, অপব্যাখ্যা ও পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিদ্যমান। কেউ নারীকে অবমূল্যায়ন করে, কেউ আবার সীমালঙ্ঘন করে তাকে স্বাধীনতার নামে বিপথে ঠেলে দেয়। অথচ কুরআন নারীকে neither oppressed nor objectified — বরং সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন, সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ অংশ হিসেবে উপস্থাপন করেছে।

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব — কুরআনের আলোকে নারীর প্রকৃত মর্যাদা, তার সামাজিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থান ।

—

❑ কুরআনে নারী সৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গি :

আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

“হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন এক প্রাণ থেকে এবং সেখান থেকে সৃষ্টি করেছেন তার সঙ্গিনী।” [১]

এই আয়াতে নারীকে পুরুষের নিম্নস্তরের নয়, বরং একই উৎস থেকে সৃষ্ট — একই আত্মার অংশীদার হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

তাফসীর ইবন কাসীর অনুযায়ী, আল্লাহ তাআলা নারীকে পুরুষের থেকে নয়, বরং একই সত্তা থেকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তাদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা, মমতা ও সহযোগিতা থাকে।

এই আয়াত প্রমাণ করে — নারী পুরুষের পরিপূরক, প্রতিদ্বন্দ্বী নয়।

❑ **আল্লাহর দৃষ্টিতে আমলের পুরষ্কারে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার :**

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ، وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ، وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ، وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীল নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী নারী, এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী নারী — আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।" [২]

এই আয়াতটি ইসলামি সমাজে নারীর সমান মর্যাদা ও সুযোগের এক অনন্য ঘোষণা। এখানে দশটি গুণের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে — আল্লাহর নিকট মর্যাদা নির্ভর করে লিঙ্গের উপর নয়, বরং ঈমান, আমল ও তাকওয়ার উপর। নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সমান সুযোগ পায়।

তাফসীর ইবন কাসীরে উল্লেখ রয়েছে— এই আয়াত নাজিল হয়েছিল সেই নারীদের প্রশ্নের প্রেক্ষিতে, যারা জানতে চেয়েছিল, "আমরা কি পুরুষদের মতোই আল্লাহর কাছে মর্যাদাপূর্ণ?" অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা নিজেই নারীর মর্যাদা ঘোষণা করেছেন — কোনো মানবিক কণ্ঠ নয়, বরং স্বয়ং মহান সৃষ্টিকর্তার কণ্ঠ।

❑ **ইসলামে নারীর আর্থিক স্বাধীনতা :**

কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন — নারী তার সম্পদের একক মালিক, এবং কেউ তার অনুমতি ছাড়া তা ব্যবহার করতে পারবে না।

“পুরুষের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ এবং নারীর জন্য রয়েছে তাদের উপার্জনের অংশ।” [৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা নারী-পুরুষ উভয়ের অর্জন, সম্পদ ও পরিশ্রমের ফলের ওপর সমান মালিকানা ঘোষণা করেছেন। ইসলামের পূর্বে নারীর কোনো আর্থিক অধিকার ছিল না; কিন্তু ইসলাম এসে তাকে স্বতন্ত্র সম্পত্তির মালিক বানিয়েছে।

❑ **ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার :**

কুরআন নারীদের জন্য নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারের অংশ নির্ধারণ করেছে—যা ছিল এক বিপ্লবী ঘোষণা।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“পুরুষদের জন্য আছে পিতামাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ, এবং নারীদের জন্যও আছে পিতামাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ, তা অল্প হোক বা বেশি — নির্ধারিত অংশ।” [৪]

এটি ছিল ইতিহাসে প্রথম দিকের আইন, যেখানে ইসলামে নারীকে স্পষ্টভাবে উত্তরাধিকারভোগী ঘোষণা করা হয়। ইসলামে নারীর জন্য নির্ধারিত অংশ নির্ভর করে দায়িত্বের ভারসাম্যের ওপর, বৈষম্যের ওপর নয়।

❑ **কুরআনে নারীর প্রতি সদাচরণের আদেশ :**

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় নারীদের জোরপূর্বক উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করা, এবং তাদের প্রতি কষ্ট সৃষ্টি করো না যাতে তোমরা তাদের দেয়া সম্পদের কিছু অংশ কেড়ে নিতে পারো—যদি না তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করে। আর তোমরা তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো (ভাল ব্যবহার করো)। যদি তোমরা তাদের অপছন্দও করো, তবে হতে পারে যে, তোমরা যেটা অপছন্দ করো, আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।” [৫]

এই আয়াতটি নাজিল হয়েছিল এমন এক সমাজে, যেখানে নারীর কোনো সম্মান ছিল না — তাকে মানুষ নয়, বস্তু হিসেবে গণ্য করা হতো। পুরুষ মারা গেলে তার স্ত্রীকেও উত্তরাধিকার হিসেবে তার পরিবারের পুরুষেরা নিজেদের সম্পত্তির মতো ভাগ করে নিত!
নারীর মতামত, ইচ্ছা, অনুভূতি — কিছুই গণ্য হতো না।

ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করলেন —

"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় নারীদের জোরপূর্বক উত্তরাধিকারসূত্রে গ্রহণ করা..."

এই এক বাক্যে ইসলাম নারীর দাসত্ব ভেঙে তাকে স্বাধীন মর্যাদা ফিরিয়ে দিল।

আল্লাহ যেন বলছেন —
“সে নারী তোমার সম্পত্তি নয়; সে তোমার মতোই মানুষ, আমারই সৃষ্টি, তোমার উপর তার কোনো জুলুম বৈধ নয়।”

এরপর আল্লাহ বলেন—

“আর তোমরা তাদের প্রতি কষ্ট সৃষ্টি করো না...”

অর্থাৎ, নারীর হৃদয়ে আঘাত দিও না, তার সম্মান নষ্ট করো না, তার প্রতি অবিচার করো না। ইসলাম কেবল তার আর্থিক অধিকার নয়, তার মানসিক শান্তি ও আবেগের নিরাপত্তাকেও সুরক্ষিত করেছে।

তারপর আল্লাহর সেই চিরন্তন উপদেশ —

“আর তোমরা তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো...”

(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

এই শব্দ “মা‘রূফ” শুধু ভালো আচরণ নয় — এর মধ্যে আছে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, দয়া, ধৈর্য, যত্ন এবং ন্যায়। অর্থাৎ, স্ত্রী যেন স্বামীর পাশে ভয়ের নয়, নিরাপত্তার অনুভূতি পায়, তার ঘর যেন হয় ভালোবাসার আশ্রয়স্থল, না যে জায়গা থেকে সে পালাতে চায়।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন—

“যদি তোমরা তাদের অপছন্দও করো, তবে হতে পারে যে, তোমরা যেটা অপছন্দ করো, আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।”

কী অসাধারণ বাক্য!
এখানে আল্লাহ শিখিয়ে দিচ্ছেন—মানুষের হৃদয় ক্ষণিকের অনুভূতিতে ভুল করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর জ্ঞান পরিপূর্ণ।
তুমি হয়তো তোমার স্ত্রীর কোনো ত্রুটি দেখছো, কিন্তু হয়তো সেই নারীর মধ্যেই আছে তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় কল্যাণ।

কখনো হয়তো সে ধৈর্যের শিক্ষা দিচ্ছে, কখনো হয়তো তার দোয়া তোমার জন্য বরকতের দরজা খুলে দিচ্ছে, আর তুমি তা বুঝছো না...

এই আয়াতের বার্তা আজও কালজয়ী। ইসলাম নারীকে কেবল স্নেহ করার নয়, বরং তার হৃদয়কে সম্মান করার শিক্ষা দিয়েছে।
স্ত্রীকে বোঝার, তার অনুভূতির কদর করার, তার কষ্টে পাশে থাকার —

এটাই প্রকৃত "সদাচরণ" (معروف)

যে মুমিন পুরুষ এই আয়াতকে হৃদয়ে ধারণ করে,
সে নারীকে ছোট করে না — বরং তাকে দেয় তার প্রকৃত মর্যাদা, কারণ সে জানে —
নারী হলো আল্লাহর অর্পিত একটি মূল্যবান আমানত।

❑ বাস্তব প্রতিফলন ও আধুনিক প্রেক্ষাপট :

আজকের বিশ্বে নারী অধিকার, নারী স্বাধীনতা নিয়ে যত আলোচনা, তার অনেক আগেই কুরআন নারীকে দিয়েছে—

- অস্তিত্বের স্বীকৃতি
- আধ্যাত্মিক সমতার ঘোষণা
- উত্তরাধিকার ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
- মর্যাদার নিশ্চয়তা

অতএব, নারীর প্রকৃত মুক্তি কুরআনের নির্দেশিত সীমার মধ্যেই নিহিত। যেখানে নারী neither a shadow nor an object — বরং সমাজের সম্মানিত অংশ, পরিবারের প্রশান্তি, এবং উম্মাহর ভিত্তি।

কুরআনে নারীকে আল্লাহ যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, তা মানুষের কল্পনার বাইরে এক উচ্চতম অবস্থান। তিনি একদিকে নারীকে করেছে জীবনের শোভা ও প্রশান্তি, অন্যদিকে উম্মাহ গঠনের ভিত্তি।

আল্লাহর বাণীতে নারীকে যে সম্মান দেওয়া হয়েছে, সেই সম্মানই মানবজাতির প্রকৃত ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে।

হৃদয়ে প্রশ্ন জাগে— আজ আমরা সেই কুরআনিক সম্মান কি নারীর প্রতি ফিরিয়ে দিতে পেরেছি?

—

রেফারেন্স

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১
[২] সূরা আহযাব, আয়াত : ৩৫
[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৩২
[৪] সূরা নিসা, আয়াত : ৭
[৫] সূরা নিসা, আয়াত : ১৯

—

❑ অধ্যায় - ০৫ : হাদীসে নারীর সম্মান

এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে—হাদীসের আলোকে ইসলামে নারীর মর্যাদা কত উচ্চ, এবং কীভাবে নবী ﷺ মা, কন্যা ও স্ত্রী—প্রতিটি ভূমিকায় নারীর সম্মান, অধিকার ও আধ্যাত্মিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জাহিলিয়াতের অমানবিক সমাজের বিপরীতে হাদীস নিশ্চয়তা দিয়েছে যে নারী হলো জান্নাতের দরজা, রহমতের মাধ্যম এবং পরিবার-সমাজের হৃদয়—এটি ইসলামের নারীর প্রতি অনন্য সম্মানেরই প্রমাণ।

—

ইসলাম এমন এক জীবনব্যবস্থা যা নারীকে তার প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে — না সে পুরুষের দাসী, না প্রতিযোগী; বরং পরিপূরক ও সম্মানিত অংশ। নবী করিম ﷺ এমন সময়ে নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা করেছেন, যখন আরব সমাজে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো।

আল্লাহর রাসূল ﷺ নারীর প্রতিটি ভূমিকায় সম্মানের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন — মা হিসেবে, কন্যা হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং সমাজের সদস্য হিসেবে।

❑ ইসলামে মা-হিসেবে নারীর মর্যাদা

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ.

এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন,
“হে আল্লাহর রাসূল! আমার সঙ্গ ও সেবার সর্বাধিক অধিকার কার?”
তিনি বললেন, “তোমার মা।”
লোকটি জিজ্ঞেস করল, “এরপর কে?”
তিনি বললেন, “তোমার মা।”
আবার জিজ্ঞেস করলে বললেন, “তোমার মা।”
চতুর্থবারে বললেন, “তারপর তোমার পিতা।” [১]

ইমাম নববী (রহ.) বলেন —

“এই হাদীস নারীর মর্যাদা প্রদর্শনের সর্বোচ্চ নিদর্শন। এখানে তিনবার ‘মা’ বলা হয়েছে তার ত্যাগ, দুঃখ ও কষ্টের প্রতিদানে। সন্তান জন্মদানে ও লালনে নারীর পরিশ্রমের মূল্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন।” [২]

❑ কন্যা হিসেবে নারীর মর্যাদা

مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

“যে ব্যক্তির তিনটি কন্যা সন্তান থাকে এবং সে তাদের প্রতিপালনে ধৈর্য ধারণ করে, খাবার-পানীয় ও পোশাকের ব্যবস্থা করে, সে ব্যক্তির জন্য কন্যারা হবে কিয়ামতের দিনে জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী ঢাল।” [৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে:
“যে ব্যক্তি দুই কন্যা সন্তানকে প্রতিপালন করবে যতক্ষণ না তারা বালেগা হয়, আমি ও সে কিয়ামতের দিন এভাবে (আঙুল জোড়া দিয়ে দেখিয়ে) জান্নাতে একসাথে থাকব।” (সহীহ মুসলিম)

ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ.) বলেন —
“আরব সমাজে কন্যা সন্তান ছিল লজ্জার প্রতীক, অথচ নবী ﷺ তাদের জান্নাতের চাবিকাঠি বানালেন। এটাই ইসলামের বিপ্লব।” [৪]

❑ স্ত্রী হিসেবে নারীর মর্যাদা

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

“দুনিয়া একটি উপকরণ, আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপকরণ হচ্ছে নেক চরিত্রবান স্ত্রী।” [৫]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন —

“এখানে ‘الصَّالِحَةُ’ (সৎ স্ত্রী) বলতে বোঝানো হয়েছে এমন নারী, যিনি আল্লাহর আনুগত্যে জীবনযাপন করেন এবং স্বামীকে ঈমান, চরিত্র ও প্রশান্তির পথে সহায়তা করেন। এই নারী দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য।” [৬]

❑ ইসলামের নববী শিক্ষার সারমর্ম হলো

নারী হলো জান্নাতের তিনটি দরজা

- মা হিসেবে
- কন্যা হিসেবে
- স্ত্রী হিসেবে

নবী ﷺ এর বাণীতে নারী কেবল সমাজের সদস্য নন; নারী হলো ঈমান, ত্যাগ, দয়া ও মমতার এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

আজকের যুগে যদি নারী নিজের এই ইসলামী মর্যাদা চিনে নেয়, তবে সমাজে আলোর পুর্ণ জাগরণ ঘটবে ইন শা আল্লাহ।

—

রেফারেন্স

[১] সহীহ বুখারী : ৫৯৭১ ; সহীহ মুসলিম : ২৫৪৮

[২] শরহ মুসলিম, ইমাম নববী

[৩] (মুসনাদে আহমদ : ১১৮৬৩ ; সুনানে ইবনে মাজাহ : ৩৬৬৯

[৪] ফাতহুল বারী, ১০/৪২২

[৫] সহীহ মুসলিম : ১৪৬৭ ; সুনানে নাসায়ী : ৩২৩২

[৬] আল-জামি লি আহকামিল কুরআন, সূরা আন-নিসা, তাফসীর ৪:৩৪

—

❑ অধ্যায় - ০৬ : নারীবাদ বনাম ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে—পশ্চিমা নারীবাদ কীভাবে মুসলিম নারীদের চিন্তা, পরিচয় ও মর্যাদা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করেছে এবং ইসলাম কীভাবে স্পষ্ট দলিলভিত্তিক নির্দেশনার মাধ্যমে নারীর প্রকৃত অধিকার, মর্যাদা ও সামগ্রিক ভূমিকার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীবাদ ও ইসলামের মধ্যে উৎস, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়েছে যে, ইসলামই নারীর স্বকীয়তা, নিরাপত্তা ও সম্মানকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে।

—

পশ্চিমা বিশ্ব বরাবরই মুসলিম সমাজকে লক্ষ্যবস্তু করে এসেছে, বিশেষত তাদের টার্গেট বরাবরই মুসলিম নারীদের উপর। কারণ তারা জানে নারীই এই উম্মাহর অর্ধেক অংশ এবং সমাজের বাকি অর্ধেক অংশও আসে এই নারীদের থেকেই। তাই মুসলিমদের এই একটি অংশে তারা ফাটল ধরাতে পারলে পুরো উম্মাহর মাঝে তারা ফাটল ধরাতে সক্ষম হয়ে যাবে, তাই তাদের অন্যতম কৌশল হচ্ছে—নারীবাদের নামে মুসলিম নারীদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত করে দিয়ে এই উম্মাহর ভীত নষ্ট করে দেয়া।

তাদের অপপ্রচারের একটি বড় স্লোগান হলো, "ইসলাম নারীর ওপর বাড়াবাড়ি রকমের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে, নারীকে করেছে ঘরবন্দী এবং অধিকারহীন।"

এবং অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি আজ এই মিথ্যা প্রোপাগান্ডার প্রভাবে অনেক মুসলিম নারী নিজের বিশ্বাস ও মর্যাদা নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগতে শুরু করেছে। তাদের মনে প্রশ্ন জাগে—

"আমরা কি তাহলে সত্যিই আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত?"

এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেতে হলে আমাদের প্রয়োজন — নারীবাদ বনাম ইসলাম নিয়ে একটি বিশদ ও বাস্তবভিত্তিক বিশ্লেষণ।

❑ নারীবাদের সংজ্ঞা ও আদর্শ

নারীবাদ- এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Feminism এবং আরবি ভাষায় যাকে বলা হয় نِسْوِيَّة (নিসওয়িয়্যাহ)। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুযায়ী,

"নারীবাদ এমন এক মতবাদ যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমঅধিকার নিশ্চিত করার পক্ষে কাজ করে।"

অর্থাৎ, নারীবাদ দাবি করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি অংশে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না— হোক তা পরিবার, চাকরি, রাজনীতি বা সামাজিক নেতৃত্বে।
এই স্লোগানগুলো বাহ্যিকভাবে খুব চটকদার এবং আকর্ষণীয় হলেও, বাস্তবে এটি সমঅধিকারের নামে নারীর স্বকীয়তা, শালীনতা ও মর্যাদাকে ধ্বংস করছে। নারীবাদের এই ভুল ধারণা নারীর নারীত্বকেই তার অজান্তে কেড়ে নিচ্ছে।

এবং এই বিষয়টা বুঝতে হলেই আমাদের জানতে হবে নারীবাদ ও ইসলামের মূল পার্থক্য সম্পর্কে।

❑ নারীবাদ ও ইসলামের মূল পার্থক্য

নারীবাদ ও ইসলাম—দুটি ধারণাই নারীকে সম্মান ও অধিকার দেওয়ার কথা বলে, কিন্তু তাদের ভিত্তি, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটিতে মানুষের নিজস্ব চিন্তা ও অভিজ্ঞতা মুখ্য, অন্যটিতে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনা ও ন্যায়ভিত্তিক ভারসাম্যই একমাত্র মূলনীতি।

১. উৎস ও ভিত্তির পার্থক্য

নারীবাদের উৎস পাশ্চাত্যের সামাজিক বিদ্রোহ ও দার্শনিক আন্দোলনে, যেখানে ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়াই ছিল লক্ষ্য। অন্যদিকে ইসলামের ভিত্তি হলো ওহি—আল্লাহর বাণী ও রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। ইসলাম নারীর মর্যাদাকে কোনো মানবরচিত চিন্তা চেতনায় নয়, বরং আল্লাহর বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২. স্বাধীনতা বনাম দায়িত্ব

নারীবাদ "আমি যা চাই তাই করব"—এই ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, যেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সর্বোচ্চ। কিন্তু ইসলাম শেখায়, স্বাধীনতা মানেই মন যা চায় তাই করা নয়; বরং ন্যায় ও পরিশুদ্ধতার সীমার মধ্যে থেকে নিজের মর্যাদা রক্ষা করা। ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে রক্ষা করে, তবে সেটিকে পাশ্চাত্য অশ্লীলতায়পূর্ণ স্বাধীনতায় নয়, বরং সমাজ ও ঈমানের স্বার্থে ইসলাম নারীর স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত রাখে।

৩. মর্যাদার ধারণা

নারীবাদ মর্যাদাকে মাপে বাহ্যিক সমতার মানদণ্ডে—পুরুষ যা করছে, নারীও তাই করবে। পুরুষ যে অধিকার নিয়েছে নারীও তাই নিবে। মোটকথা নারীবাদে মর্যাদা মানেই সমতা। কিন্তু ইসলাম বলে সুসমতার কথা। ইসলাম মর্যাদাকে মাপে তাকওয়া ও আমলের মাধ্যমে। আল্লাহ বলেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে, যে সর্বাধিক পরহেজগার।" [১]

অতএব, ইসলামে মর্যাদা অর্জনের পথ পুরুষ ও নারীর জন্য সমান, কিন্তু তাদের ভূমিকা ও দায়িত্ব ভিন্ন।

৪. পরিবার ও সমাজব্যবস্থার ধারণা

"স্ত্রী হিসেবে নারী, মা হিসেবে নারী" — নারীবাদ নারীর এ পরিচয়গুলোকে প্রগতির অন্তরায় হিসেবে দেখে এবং নারীকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। ফলে পরিবার ভেঙে যায়, সম্পর্ক দুর্বল হয়। কিন্তু ইসলাম নারীর এ পরিচয়গুলোর মাধ্যমেই নারীকে দেয় মর্যাদার এক উন্নত স্তর। পরিবার জীবনে ইসলাম নারীকে আখ্যায়িত করে প্রশান্তির প্রতীক হিসেবে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

"তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের মাধ্যমে প্রশান্তি পাও।" [২]

৫. পুরুষ-নারীর পার্থক্য দৃষ্টিভঙ্গি

"পুরুষ-নারী সমান"—নারীবাদের সর্বোচ্চ অযৌক্তিক স্লোগান গুলোর মাঝে এটি অন্যতম। নারীবাদ সৃষ্টিগত নারী পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক এই প্রাকৃতিক পার্থক্যকে অস্বীকার করে। অথচ ইসলাম এটি স্বীকার করে এবং যৌক্তিক প্রতিফল দেখায়, ইসলাম বলে— নারী-পুরুষ সৃষ্টিগত ভাবে ভিন্ন কিন্তু তাদের উৎস অভিন্ন এবং তাঁরা একে অপরের পরিপূরক।

যৌক্তিকতার আলোকে দেখলে আমরা বুঝতে পারি নারী-পুরুষের মাঝে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক দায়িত্বে এই পার্থক্য স্বাভাবিক, যা মেনে নিলেই সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব এবং একে অস্বীকার করলেই সমাজে দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা।

৬. উদ্দেশ্যের পার্থক্য

নারীবাদের লক্ষ্য—শুধুমাত্র পার্থিব জীবন কেন্দ্রিক।নারীর পার্থিব অধিকার ও সামাজিক অবস্থান পুনরুদ্ধার।

কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য—পার্থিব সফলতা পেরিয়ে পরকালীন মুক্তি। ইসলাম নারীকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের সফলতার পথে পরিচালিত করেছে। ইসলাম নারীকে শুধুমাত্র সমাজের অংশ নয়, বরং ঈমানের প্রতিনিধি হিসেবে দেখে।

❑ ইসলামে নারীর প্রতি কোমল ও সম্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম নারীর প্রতি যে কোমলতা ও সম্মান দেখিয়েছে, তা অন্য কোনো মতবাদ বা সভ্যতায় অনুপস্থিত। এর পেছনে দুটি বাস্তব কারণ রয়েছে—

১. শারীরিক কাঠামো

আল্লাহ তাআলা নারীকে কোমল, নম্র ও সংবেদনশীল স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই কোমলতা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি তাঁর সন্তান লালন-পালন, সংসার পরিচালনা ও মানবিক মমতার স্বাভাবিক শক্তি।

২. মানসিক গঠন

নারীর হৃদয় ভালোবাসা, দয়া ও সহানুভূতিতে ভরা। তার অশ্রু ও মমতাই মানবতার সৌন্দর্য। এই আবেগ নারীর ত্রুটি নয়— বরং আল্লাহর এক বিশেষ দান।

এই শারীরিক ও মানসিক পার্থক্যের কারণেই ইসলাম দায়িত্ব বণ্টনে ভারসাম্য এনেছে।
পুরুষের উপর আরোপ করা হয়েছে রক্ষণাবেক্ষণ, নেতৃত্ব ও নিরাপত্তার দায়িত্ব।
অন্যদিকে নারীর উপর দান করা হয়েছে সন্তান প্রতিপালন, শিক্ষা ও স্নেহের দায়িত্ব।
এই ভারসাম্যই আল্লাহর সৃষ্টি ব্যবস্থার সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা।

❑ মুসলিম সমাজে নারীর ভূমিকা

ইসলামে নারী শুধু পরিবারের অংশ নয়; তিনি পুরো সমাজের নৈতিক ভিত্তি। ইসলাম নারীকে এই পরিমাণ সম্মান দিয়েছে যে, একজন পুরুষ কতটুকু উত্তম তা নির্ভর করছে নারীর দেয়া স্বীকৃতির উপর।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

"তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।" [৩]

ইসলাম নারীর প্রতি যে মর্যাদা, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা দিয়েছে, তা কোনো মতবাদ বা আন্দোলন দিতে সক্ষম নয়।
নারীবাদ যে "স্বাধীনতা"র দাবি তোলে, সেটি আসলে নারীর মর্যাদাকে ধ্বংস করে এবং পারিবারিক বন্ধন ভেঙে দেয়।
অপরদিকে ইসলাম নারীর মর্যাদাকে রক্ষা করে, তার প্রকৃত ভূমিকা ও সৌন্দর্যকে স্বীকৃতি দেয়।

এবং এই সৌন্দর্যমন্ডিত একজন দীনদার নারী একটি গোটা সমাজকে, একটি গোটা প্রজন্মকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম।

আরবিতে প্রচলিত একটি প্রবাদ রয়েছে—

مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا

"পুরুষ শিক্ষিত হলে একজন মানুষ শিক্ষিত হয়, কিন্তু নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়।"

অতএব, যদি আমরা চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আল্লাহভীরু, নৈতিকতাসম্পন্ন ও দীনদার হোক—তবে প্রথমেই আমাদের মায়েদেরকে দীনের আলোয় গড়ে তুলতে হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল মুসলিম নারীকে দীনের সঠিক উপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাস দান করুন।

রেফারেন্স

[১] (সূরা হুজুরাত ৪৯:১৩)
[২] (সূরা রূম ৩০:২১)
[৩] (তিরমিজি, হাদীস: ১১৬২)

—

❑ অধ্যায় - ০৭ : কথিত নারীবাদের আড়ালে সমকামিতার ফাঁদ

বর্তমান বিশ্বে নারীবাদ (Feminism) ও সমকামিতা (LGBTQ) আন্দোলনকে "স্বাধীনতা" ও "মানবাধিকারের" প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ এই দুই আন্দোলনের মূল দর্শন একই — আল্লাহর বিধান ও প্রাকৃতিক নিয়ম (ফিতরাহ) অস্বীকার করা। এই গবেষণাপত্রে নারীবাদ ও LGBTQ মতাদর্শের দার্শনিক শেকড়, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশ্লেষণ তুলে ধরা হয়েছে।

—

আধুনিক সভ্যতা "স্বাধীনতা" ও "সমতা"-কে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে মানুষ আজ ভুলে গিয়েছে কে প্রকৃত মুক্তিদাতা!
নারীবাদ দাবি করছে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না, আর LGBTQ দাবি করছে যৌন ও লিঙ্গ পরিচয় নির্ধারণের পূর্ণ স্বাধীনতা। অর্থাৎ LGBTQ- এর মতে একজন জন্মগত পুরুষ যদি দাবি করে আমি মেয়ে তবে সমাজকে তার সেই অবাস্তব এবং ঘৃণ্য দাবিই মেনে নিতে হবে। একইভাবে একজন নারী যদি দাবি করে আমি পুরুষ, তবে তার ক্ষেত্রেও সমাজ বাধ্য হবে তার সেই দাবি মেনে নিতে।

কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে — যিনি এই সমস্ত সৃষ্টির একক স্রষ্টা কেবল তিনিই সৃষ্টি ও সীমারেখা নির্ধারণের একসচ্ছ অধিকারী।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন:

"সে কি দেখেনি, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকেই তার রব বানিয়ে নিয়েছে?" [১]

এই আয়াত মানবজাতির এক চিরন্তন রোগকে চিহ্নিত করেছে — যখন মানুষ আল্লাহর বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজের ইচ্ছাকে উপাস্য বানায়। যেমনটা নারীবাদ কিংবা LGBTQ তে আমরা দেখতে পারি।

নারীবাদ ও সমকামিতা—এই দুই আন্দোলনের দর্শন একসূত্রে গাঁথা। উভয়ের মূলে রয়েছে একই চিন্তাধারা:

"আমার শরীর, আমার অধিকার।"

“ধর্মীয় বিধান ও নৈতিক সীমা ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তরায়।”

❑ নারীবাদ ও LGBTQ আন্দোলনের আদর্শগত মিল

১. পশ্চিমা দর্শনের শেকড়

নারীবাদ ও সমকামী আন্দোলন উভয়ই পশ্চিমা সেক্যুলার-লিবারেল চিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত, যেখানে ধর্মকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ মূল্য হিসেবে গণ্য করা হয়।

John Stuart Mill, Simone de Beauvoir, Judith Butler প্রমুখ দার্শনিকরা এই দর্শনের মূল প্রচারক।

তারা বলে:
“লিঙ্গ ও যৌনতা কোনো ঈশ্বরপ্রদত্ত বিষয় নয়, বরং সামাজিকভাবে নির্মিত ধারণা।”

কুরআন বলে:

“তারা আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায় তাদের মুখের ফুঁ দিয়ে, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলো পূর্ণ করবেন।” [২]

অর্থাৎ, আল্লাহর ফিতরাহ পরিবর্তনের চেষ্টা কখনো সফল হবে না।

২. নারীবাদ ও LGBTQ’র পারস্পরিক জোট

আজ পশ্চিমে “Gender Equality” ও “Gender Fluidity” একই ছাতার নিচে অবস্থান করছে। নারীবাদীরা “My Body, My Choice” স্লোগানে যেমন দেহের স্বাধীনতা দাবি করে, LGBTQ আন্দোলনও একই যুক্তিতে যৌন প্রবৃত্তির স্বাধীনতা চায়।

উভয়ের মূল ধারণা:

“মানুষ নিজ দেহ, পরিচয় ও জীবনের পূর্ণ মালিক; ধর্ম বা সমাজের কোনো অধিকার নেই।”

এভাবে নারীবাদ হয়ে উঠেছে LGBTQ প্রোপাগান্ডার দার্শনিক ও নৈতিক সেতু। ফলাফল — মুসলিম সমাজেও ক্রমে এই ধারণা “মানবাধিকার” নামে প্রবেশ করছে।

❑ ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

১. ফিতরাহ বা প্রাকৃতিক নিয়ম

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তুমি নিজেকে সেই ফিতরাহর দিকে ফেরাও, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করা যাবে না।” [৩]

এই ফিতরাহ হলো পুরুষ-নারীর স্বভাবগত পরিপূরকতা। যেখানে নারী মাতৃত্বে ও লালন-পালনে অনন্য, আর পুরুষ দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণে উপযুক্ত।

কিন্তু নারীবাদ এই পার্থক্য অস্বীকার করে বলে —
“আমরা সমান, ভিন্ন নই।”
আর LGBTQ বলে —
“আমরা লিঙ্গকেও মানি না, ভালোবাসা লিঙ্গনিরপেক্ষ।”

দুটিই আল্লাহর ফিতরাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

২. সমকামিতার বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

“তোমরা কি নারীদের ছেড়ে পুরুষদের কাছে কাম বাসনা পূরণের জন্য যাও? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জাতি।” [৪]

“অতঃপর তাদের উপর এক প্রচণ্ড শব্দ পাঠানো হলো এবং তাদের শহর উল্টে ফেলা হলো; এরপর তাদের উপর ঝরানো হলো পাথরের বৃষ্টি।” [৫]

রাসূল ﷺ বলেছেন,
“যে ব্যক্তি লূতের জাতির কাজ করে, তাকে ও যার সাথে তা করে উভয়কেই হত্যা কর।” [৬]

ইসলামে সমকামিতা শুধু পাপ নয়, বরং সমাজ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ।

৩. নারীবাদের প্রতি ইসলামের জবাব

“পুরুষ হলো নারীর রক্ষণাবেক্ষণকারী, কারণ আল্লাহ এক পক্ষকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।” [৭]

রাসূল ﷺ বলেছেন:
“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম আচরণ করে।” [৮]

ইসলাম নারীর মর্যাদা দিয়েছে দায়িত্ব ও পরিপূর্ণতার ভিত্তিতে, কিন্তু নারীবাদ দিয়েছে বিদ্রোহ ও প্রতিযোগিতার নামে বিভ্রান্তি।

❑ বাস্তব প্রেক্ষাপট ও পরিণতি

পশ্চিমা সমাজে এখন:

- পারিবারিক বন্ধন ভেঙে পড়েছে
- জন্মহার নাটকীয়ভাবে কমেছে
- মানসিক রোগ, হতাশা ও আত্মহত্যা বেড়েছে

Pew Research (2024) অনুযায়ী — ২০৩০ সালের মধ্যে ইউরোপের প্রায় ৩০% পরিবারে থাকবে “No traditional male-female marriage”। [৯]

এটাই সেই সমাজের পরিণতি, যারা আল্লাহর সীমারেখা অতিক্রম করেছে।

❑ মুসলিম নারীর করণীয়

➤আকীদাহ ও ইলম অর্জন করা: ইসলামি জ্ঞানের মাধ্যমে চিন্তার দৃঢ়তা অর্জন।

➤নিজ পরিচয়ে গর্ববোধ: “আমি মুসলিম নারী, ইসলামই আমার মুক্তি।”

➤প্রোপাগান্ডা চিনে ফেলা: “ফেমিনিজম”, “জেন্ডার রাইটস”, “প্রাইড” – এসব ট্যাগ থেকে দূরে থাকা।

➤দাওয়াহ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ: বোনদের মাঝে ইসলামী চিন্তার প্রচার।

➤মিডিয়া সচেতনতা: সোশ্যাল মিডিয়ার বিকৃত বার্তাগুলো বুঝে প্রতিরোধ করা।

“তারা আল্লাহকে ভুলে গেল, ফলে আল্লাহও তাদের নিজেদেরকে ভুলিয়ে দিলেন।” [১০]

পশ্চিম আজ “মুক্তি”র নামে নিজেরই শৃঙ্খলে বন্দি।
আর মুসলিমরা যদি তাদের অনুসরণ করে, তবে সেই অন্ধকার আমাদের ঘরেও নেমে আসবে।

ইসলামই একমাত্র সত্য মুক্তির পথ—যেখানে নারী বন্দি নয়, বরং আল্লাহর আনুগত্যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। যে নারী ইসলাম আঁকড়ে ধরে, সে কখনও কারও অধীন নয় — বরং সে হয়ে মহা সম্মানিত আল্লাহর প্রিয় বান্দি।

—

রেফারেন্স :

[১] সূরা আল-জাসিয়া, ৪৫:২৩
[২] সূরা আস-সাফ, ৬১:৮
[৩] সূরা আর-রূম, ৩০:৩০
[৪] সূরা আল-আ'রাফ ৮০–৮১
[৫] সূরা হিজর ৭৩–৭৪
[৬] তিরমিযি, হাদীস ১৪৫৬
[৭] সূরা আন-নিসা ৩৪
[৮] তিরমিযি ৩৮৯৫
[৯] Pew Research Center. (2024). Family and Gender Trends in Western Societies.
[১০] সূরা হাশর, ৫৯:১৯

—

❑ অধ্যায় - ০৮ : কথিত নারীবাদী ও ওরিয়েন্টালিস্টদের কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ : এবং ইসলামের জবাব

এই গবেষণাপত্রে ওরিয়েন্টালিস্ট ও নারীবাদীদের ইসলাম সম্পর্কিত খুব সাধারণ কিছু অভিযোগসমূহ— যেমন পর্দা, বহুবিবাহ, পুরুষ-নারীর ভূমিকা, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে— বিশ্লেষণ করে যুক্তিনির্ভর ইসলামী উত্তর উপস্থাপন করা হয়েছে।

—

❑ ওরিয়েন্টালিজম ও নারীবাদ

ওরিয়েন্টালিজম (Orientalism) হলো পশ্চিমা চিন্তাবিদদের দ্বারা ইসলামী সভ্যতা ও পূর্বের সংস্কৃতিকে বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস।

বিশিষ্ট গবেষক এডওয়ার্ড সাঈদ তাঁর বিখ্যাত বই Orientalism (1978)-এ বলেন—

"পশ্চিম বিশ্ব ইসলামকে সবসময় পশ্চাৎপদ, নারীবিদ্বেষী ও সন্ত্রাসী হিসেবে চিত্রিত করেছে।" [১]

অন্যদিকে, নারীবাদ (Feminism) মূলত ইউরোপে জন্ম নেওয়া একটি সামাজিক আন্দোলন, যার উদ্দেশ্য ছিল নারীর ভোটাধিকার ও শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পরবর্তীতে এটি ধর্মনিরপেক্ষ ও শরীরকেন্দ্রিক রূপ লাভ করে, যেখানে স্বাধীনতা মানেই সীমাহীন স্বাধীনতা — এই দর্শন ছড়িয়ে পড়ে।

- ফলাফল?
- যে নারীরা মুক্তি চেয়েছিল, তারা আজ বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র ও বাজার অর্থনীতির "পণ্য" হয়ে গেছে।

অন্যদিকে, ইসলাম নারীকে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মর্যাদা দিয়েছে, যা কোনো ধর্ম বা আন্দোলন দিতে পারেনি।

❑ ওরিয়েন্টালিস্ট ও নারীবাদীদের উত্থাপিত প্রশ্ন ও ইসলামী জবাব

➤প্রশ্ন - ০১ : ইসলাম কেন মেয়েদের পর্দার মাধ্যমে বন্দী করে রেখেছে? নারী কি ইসলামে স্বাধীন নয়?

উত্তর:
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আগে বুঝতে হবে — ইসলাম "স্বাধীনতা" শব্দটিকে কিভাবে দেখে।
ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা মানে নিজের খেয়াল-খুশি মতো চলা নয়, বরং নিজেকে আল্লাহর নির্দেশের অধীনে এনে আত্মাকে মুক্ত করা। যে নারী তার দেহ, আত্মা ও ইজ্জতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আড়ালে রাখে — সে কোনোভাবেই বন্দী নয়, বরং সে সম্মান ও শান্তির দুর্গে অবস্থানকারী এক রাণী।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে নবী! তোমার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ এবং মুমিন নারীদের বলো তারা যেন নিজেদের উপর চাদর ঢেকে রাখে। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং তারা কষ্ট দেওয়া থেকে রক্ষা পাবে।" [২]

এই আয়াতের শেষের অংশেই উদ্দেশ্য পরিষ্কার —
"তারা যেন কষ্ট দেওয়া থেকে রক্ষা পায়।"
অর্থাৎ পর্দা কোনো শাস্তি নয়, বরং একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা — সমাজের কদাচার, লালসা ও অশালীন দৃষ্টির আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার এক ঢাল।

পশ্চিমে আজ "ফ্যাশনের নামে উন্মুক্ততা" এতটাই স্বাভাবিক হয়েছে যে নারী আজ একেকটি বিজ্ঞাপন পণ্যের মতো ব্যবহৃত হচ্ছে। তাদের শরীর বিক্রি হচ্ছে কসমেটিকস, গাড়ি, এমনকি পানীয়ের বিজ্ঞাপনে!

- এটাই কি মুক্তি?
- বরং তারা দেহের স্বাধীনতা পেয়ে আত্মার বন্দিত্বে পড়েছে।

ইসলাম নারীকে তার সৌন্দর্য রক্ষা করতে বলেছে, যাতে সে তার মূল্য "রূপে" নয়, চরিত্রে ও ঈমানে পায়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“যে নারী সালাত পড়ে, রমজানের রোযা রাখে, ইজ্জত রক্ষা করে এবং স্বামীকে মান্য করে — তাকে বলা হবে, ‘যে দরজা দিয়ে চাও, জান্নাতে প্রবেশ করো।” [৩]

এই সম্মান কোনো সভ্যতা দেয়নি।

➤প্রশ্ন - ০২ : পর্দা শুধু নারীর জন্য কেন? পুরুষের জন্য কেন নয়?

উত্তর:

প্রথমত,নারীবাদী/ওরিয়েন্টালিস্টদের উত্থাপিত এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের তাকাতে হবে ইসলামে নাজিলকৃত প্রথম পর্দার নির্দেশের দিকে।

অবাক করার বিষয় হলো, ইসলামে পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে প্রথম নির্দেশ নারীদের জন্য নয় বরং পর্দার বিধানের প্রথম নির্দেশ নাযিল হয় পুরুষদের জন্য!

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

“হে নবী! মুমিন পুরুষদের বলুন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান হেফাজত করে।” [৪]

সুবহানাল্লাহ! এটি পর্দার বিধানের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত, যেটি নাযিল হয় মুমিন পুরুষদের উদ্দেশ্যে।এবং এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মমিন পুরুষদের জানিয়ে দিচ্ছেন পর্দার প্রথম স্তর হলো দৃষ্টি সংযম।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই পুরুষদেরকেই বলছেন চোখ নামিয়ে রাখতে, যেন তারা দৃষ্টি সংযম করে। আবার এরপরই পরের আয়াতে নারীদের বলা হয়েছে একই নির্দেশ-

“আর মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন দৃষ্টি সংযত রাখে, লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং যা স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।” [৫]

অর্থাৎ, পুরুষের চোখের পর্দা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি নারীর দেহের পর্দা অপরিহার্য।

যখন একজন নিজের দৃষ্টি অবনত করে দৃষ্টির হেফাজত করে, এবং আরেকজন নিজেকে সকলের ভোগ্য বস্তু না বানিয়ে নিজের মূল্যবান দেহটিকে আবৃত করে রাখে—তখনই সমাজে ফিতনা (অশ্লীলতা ও ব্যভিচার) রোধ হয়।

➤কেন পুরুষের জন্য চোখের পর্দা?

পুরুষের প্রকৃতিতে রয়েছে দৃশ্যগত আকর্ষণ—অর্থাৎ, চোখের মাধ্যমে তার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়। এ কারণেই ইসলাম পুরুষকে প্রথমে শিখিয়েছে দৃষ্টি সংযমের মাধ্যমে আত্মসংযম।

এটা কেবল পাপ থেকে নয়, মানসিক শান্তির দিক থেকেও প্রমাণিত। আজকের মনোবিজ্ঞানও বলছে — "অশ্লীলতা দেখলে মস্তিষ্কে ডোপামিন বৃদ্ধি পায় যা মানুষকে আসক্ত করে তোলে।" ইসলাম এই ক্ষতির প্রতিরোধ করেছে অনেক আগেই—দৃষ্টি সংযমের মাধ্যমে।

➤কেন নারীর জন্য দেহের পর্দা?

নারীর প্রকৃতিই সৌন্দর্য ও লজ্জাশীলতার সমন্বয়।
আল্লাহ তাঁকে এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তাঁর দেহ ও রূপ পুরুষদের জন্য আকর্ষণীয়।
তাই ইসলাম নারীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা রক্ষায় পর্দাকে বন্দীত্ব নয় বরং ঢাল (protection) হিসেবে দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"হে নবী! আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের চাদর নিজেদের উপর ভালোভাবে টেনে নেয়। এতে তাদের চেনা সহজ হবে এবং তাদের কষ্ট দেওয়া হবে না।" [৬]

লক্ষ্য করুন, আল্লাহ বলেছেন — "যাতে তাদের কষ্ট দেওয়া না হয়"। অর্থাৎ, পর্দা নারীর সম্মান, মর্যাদা ও সুরক্ষার জন্য — কোনো শৃঙ্খল নয় বরং এটি হলো নারীর জন্য ঢাল স্বরূপ (protection)।

ইসলাম হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। এ কারণেই ইসলাম পর্দার ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে এই ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা দিয়েছে—
নারীর জন্য পোশাকের পর্দা, পুরুষের জন্য চোখের পর্দা।

রত্নভরা বাক্সকে যেমন আমরা সুরক্ষার জন্য খোলা ছেড়ে দেই না বরং স্বযত্নে ঢেকে রাখি, কারণ সেটি মূল্যবান। ঠিক তেমনি আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাবান্দবীদেরকেও পর্দার মাধ্যমে রক্ষা করতে চান, কারণ একজন নারী ইসলামে অমূল্য রত্ন।

➤প্রশ্ন - ০৩ : কেন নারী ঘর সামলাবে আর পুরুষ বাহিরে? এটা কি বৈষম্য নয়?

উত্তর:

এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে আমাদের বুঝতে হবে 'বন্দীত্ব এবং স্বাধীনতার' মাপকাঠি। ইসলামে কখনোই নারীর ঘরে থাকা মানে তাকে গৃহবন্দী বলা হয়নি। বরং এটি হলো দায়িত্বের ভারসাম্য।

প্রতিটি মানুষকে আল্লাহ ভিন্ন প্রকৃতির অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন —

পুরুষের মাঝে শক্তি ও রুজির দায়িত্বের প্রবণতা, নারীর মাঝে মমতা, লালন ও মানসিক প্রশান্তির ক্ষমতা। আর এটিই প্রকৃত ভারসাম্য যা আজকের বিজ্ঞানও স্বীকার করেছে।

বিজ্ঞান বলছে,

নারীর মস্তিষ্কে Oxytocin (যাকে love hormone বা motherhood hormone বলা হয়) এর নিঃসরণ তুলনামূলকভাবে বেশি। এটি মমতা, সহানুভূতি ও যত্নশীলতা বৃদ্ধি করে, যার ফলে সন্তান প্রতিপালন, গৃহের আবেগময় পরিবেশ বজায় রাখা ও সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করা নারীর জন্য স্বাভাবিক ও সহজ হয়।

আর পুরুষের শরীরে Testosterone হরমোনের মাত্রা বেশি, যা তাকে শারীরিক শক্তি, সাহস, ঝুঁকি গ্রহণ ও নেতৃত্বমূলক কাজের প্রতি অধিক সক্ষম করে তোলে। এ কারণেই পুরুষ বাহিরের শ্রম, যুদ্ধ, ব্যবসা, সমাজনেতৃত্ব ও উপার্জনের ক্ষেত্রে স্বভাবতই বেশি মানিয়ে নিতে পারে।

নারী-পুরুষের এই দুই দায়িত্বই নিজ নিজ অবস্থান থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — যেখান থেকে কোনোটিকেই কম গুরুত্বপূর্ণ বলার সুযোগ নেই, বরং এই দুই দায়িত্বের একটির অবহেলা করলে অপরটি ভেঙে পড়বে এবং পরিবারে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তাই ইসলাম এই দু'য়ের মাঝে দিয়েছে একটি ভারসাম্য।

পুরুষের দায়িত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন :

“পুরুষগণ নারীদের রক্ষক ও অভিভাবক, কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।” [৭]

এখানে “শ্রেষ্ঠত্ব” মানে কোনো মানমূল্য নয় — এটি দায়িত্বের ভার বহন। পুরুষ সহজেই বাইরে গিয়ে সমাজ ও অর্থনীতির চাপ বহন করতে পারে, সৃষ্টিগতভাবেই তার সেই সক্ষমতা রয়েছে, তাই আল্লাহ তাআলা তাকে সে বিষয়েই দায়িত্বশীল করে পাঠিয়েছেন।

আবার হাদিসে নারীর দায়িত্ব সম্পর্কে এসেছে :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:َ
وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

“নারী তার স্বামীর ঘরে অভিভাবক, এবং তার দায়িত্বে থাকা বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে।” [৮]

এই হাদীসে বলা হয়েছে "নারী অভিভাবক" (رَاعِيَة) — অর্থাৎ, নারীও তার দায়িত্বের ক্ষেত্রে নেতা, অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক। অভিভাবকত্ব মানেই কিন্তু শাসন নয়, বরং এই অভিভাবকত্ব মানে হল—দায়িত্ব, ভালোবাসা ও আমানত রক্ষা করা।

ইসলাম কখনও বলে না যে নারীর ভূমিকা পুরুষের চেয়ে কম বা নারী কম মর্যাদার অধিকারী। বরং ইসলাম বলে তাদের উভয়ের কাজের ক্ষেত্র আলাদা, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে উভয়ই সমান জবাবদিহি ও পুরস্কারের অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে তেমনটাই ইরশাদ করছেন :

"পুরুষ যা অর্জন করে তার জন্য সে প্রতিফল পাবে, আর নারী যা অর্জন করে তার জন্য সে প্রতিফল পাবে।" [৯]

অর্থাৎ, পুরুষ যেমন বাহিরে পরিশ্রম করে পরিবারের যোগান দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে, নারীও তেমনি ঘরের অভ্যন্তরে থেকে সন্তান প্রতিপালন ও পরিবারকে আগলে রাখার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির রক্ষা করে — তাই আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জানিয়ে দিচ্ছেন এই দু’জনেই আল্লাহর কাছে সমানভাবে প্রতিদান পাবেন তাদের আমলের ভিত্তিতে।

মোটকথা ইসলাম নারী ও পুরুষের মাঝে ছোট কিংবা বড়, সম্মানিত কিংবা অসম্মানিত, ইত্যাদি প্রতিদ্বন্দ্বী মূলক সম্পর্ক স্থাপন করেনি; বরং ইসলাম নারী ও পুরুষকে তাদের যোগ্যতা ও ক্ষেত্র অনুযায়ী অভিভাবক বানিয়েছে, দায়িত্ব দিয়েছে। পুরুষের বাহিরে যতটা দায়িত্ব, নারীর ঘরের

ভিতরে ততটাই দায়িত্ব। আর এই ভারসাম্যপূর্ণ পরিবার ব্যবস্থার মাধ্যমে নারী ও পুরুষ দুজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দিয়েই গড়ে ওঠে একটি সুশৃঙ্খল পরিবার, আর সেই পরিবারই হয় একটি শক্তিশালী সমাজের ভিত্তি এই উম্মাহর সমৃদ্ধির কারণ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের পরিবারগুলোকে জান্নাতি পরিবার হিসেবে কবুল করুন, আমিন।

➤প্রশ্ন - ০৪ : পুরুষ কেন চার বিয়ে করতে পারে, নারী কেন পারে না? এটা কি অন্যায় নয়?

উত্তর:

প্রথমেই বুঝতে হবে— ইসলাম চার বিয়ে কোনো অবশ্যই পালনীয় “আদেশ” হিসেবে দেয়নি, বরং ইসলাম এখানে একটি “সীমা” নির্ধারণ করেছে।
ইসলাম পূর্ব জাহেলি যুগে পুরুষরা শত শত স্ত্রী রাখত এবং নারীর প্রতি চরম অন্যায় করতো। সেখানে ইসলাম এসে বলল —

“ন্যায়বিচার করতে পারলে দুই, তিন বা চারটি বিবাহ করো; কিন্তু যদি আশঙ্কা করো যে ন্যায় করতে পারবে না, তবে একটিই।” [১০]

অর্থাৎ, এটি একটি সীমাবদ্ধ অনুমোদন — দায়িত্ব ও ন্যায়বিচারের কঠোর শর্তে। আর “ন্যায়” মানে শুধু আর্থিক সমতা নয়, বরং মানসিক ও সময়ের সমতা; যা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন।

আর হাদিসে এই সমতা বজায় রাখার ব্যাপারে, নারীর অধিকার রক্ষার ব্যাপারে কঠোর নির্দেশবাণী রয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেন :

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

“যে ব্যক্তির দুই স্ত্রী থাকবে এবং সে তাদের একজনের প্রতি ঝুঁকে অন্যজনের প্রতি অবিচার করবে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আসবে — তার শরীরের এক পাশ হেলে থাকবে (অর্থাৎ বিকৃত অবস্থায় উপস্থিত হবে)।” [১১]

এই হাদীসটি ইসলামে একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার শর্তের কঠোরতা স্পষ্ট করে।

রাসূল ﷺ এমন উদাহরণ দিয়েছেন, যা ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরে — যে ব্যক্তি স্ত্রীদের মধ্যে মনোযোগ, সময়, ভালোবাসা বা খরচের ক্ষেত্রে অন্যায় করবে,
সে আল্লাহর আদালতে লাঞ্ছিত অবস্থায় দাঁড়াবে — যেন তার শরীরের এক দিক পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে গেছে!

অর্থাৎ, ইসলামে চার বিবাহ অনুমোদিত হলেও ন্যায়বিচার ছাড়া তা ভয়াবহ গুনাহের কারণ।

আবার আমরা যদি আধুনিক বিজ্ঞানের দিকে তাকাই তবে আমরা দেখব, আধুনিক বিজ্ঞান বলছে পুরুষ ও নারীর জৈবিক পার্থক্য ভিন্ন ভিন্ন, যা উক্ত উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে ইসলামের ন্যায় বিচারের দাবিতে যথার্থ।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে —

পুরুষের মধ্যে Testosteron হরমোনের মাত্রা বেশি, যা তার মধ্যে যৌন ও শারীরিক উদ্যম, রক্ষণশীলতা ও বংশবৃদ্ধি প্রবণতা তুলনামূলক বেশি রাখে।

আর নারীর হরমোনাল গঠন (Oxytocin, Estrogen) তাকে বেশি আবেগনির্ভর, একনিষ্ঠ ও সম্পর্ককেন্দ্রিক করে তোলে।

অতএব, পুরুষের জন্য সীমিত সংখ্যক (চার) বিবাহের অনুমতি — প্রকৃতিগত চাহিদা ও সামাজিক ভারসাম্যের প্রতিফলন। কিন্তু নারীর জন্য একাধিক স্বামী রাখলে প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম ভেঙে যায় — কারণ নারীর শরীরে একাধিক পুরুষের শুক্রাণু প্রবেশ করলে জেনেটিক লাইনেজ ও পিতৃত্ব নির্ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞান বলে —
সন্তানের পরিচয় নির্ভর করে জিনগত মিল (DNA) এর ওপর। যদি নারীর একাধিক স্বামী থাকত, তবে সন্তানের জৈবিক পিতা নির্ধারণ করা অসম্ভব হতো।
তখন উত্তরাধিকার, বংশনাম, পারিবারিক দায়িত্ব — সব বিশৃঙ্খল হয়ে যেত।

আর ইসলাম সেই বিশৃঙ্খলা থেকে সমাজকে রক্ষা করেছে বংশরক্ষার (حفظ النسب) নীতির মাধ্যমে। এ কারণেই ইসলাম বহুবিবাহে সীমা রেখেছে পুরুষের জন্য, কিন্তু নারীর জন্য নয়। এবং নারীর মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে এটিই ভারসাম্যপূর্ণ।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন —

নারীর মস্তিষ্ক relation-centered, অর্থাৎ সম্পর্কনির্ভর। নারী এক সম্পর্কেই পূর্ণতা, ভালোবাসা ও মানসিক নিরাপত্তা খোঁজেন।
বহু সম্পর্ক তার জন্য মানসিকভাবে ক্লান্তিকর ও আত্মসম্মানবোধের পরিপন্থী।

বিপরীতে, পুরুষের মানসিক গঠন তুলনামূলক goal-centered, অর্থাৎ দায়িত্ব ও লক্ষ্যনির্ভর। তাই কোনো সামাজিক বা মানবিক পরিস্থিতিতে (যেমন যুদ্ধ, বিধবা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি, অনাথদের দায়িত্ব ইত্যাদি) একাধিক বিবাহ সমাজে স্থিতি আনতে পারে।

আর ইসলাম যখন চার বিয়ের এই সীমা নির্ধারণ করে, তখন অনেক যুদ্ধে পুরুষরা শহীদ হচ্ছিল — ফলে অসংখ্য নারী বিধবা ও অনাথ সন্তানের মা হয়ে পড়েন। তখন একাধিক বিবাহের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিত নারী ও শিশুর রক্ষা, সম্মান ও জীবিকা নিশ্চিত করা হয়েছিল।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, ইসলামের চার বিবাহের অনুমতি কোনো ভোগবিলাসের উপকরণ নয় — বরং একটি ন্যায়বিচারভিত্তিক দায়িত্বপূর্ণ একটি পরিবার ব্যবস্থা। যেখানে -

➪ পুরুষের প্রাকৃতিক গঠন,
➪ নারীর মানসিক স্বভাব,
➪ বংশরক্ষার প্রয়োজন,
➪ এবং সামাজিক ভারসাম্য,

সব কিছু মিলিয়ে এটি মানবতার জন্য এক ভারসাম্যপূর্ণ বিধান। এর মাধ্যমে ইসলাম নারীর মর্যাদা বিন্দু পরিমাণও কমায়নি; বরং তাকে রক্ষা করেছে বিভ্রান্ত সম্পর্ক, অবৈধ বংশ, ও মানসিক বিশৃঙ্খলা থেকে। আর পুরুষকে দিয়েছে সীমিত স্বাধীনতা — শর্ত হলো ন্যায়বিচার, যা পূরণ করতে পারলে তবেই বৈধ।

➤প্রশ্ন ০৫ : ইসলামে নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক কেন?

উত্তর:
এই গবেষণা পত্রের শুরুতেও অন্যান্য অধ্যায়ে আমরা জেনে এসেছি, ইসলাম সব ক্ষেত্রে সমতার কথা বলে না; বরং ইসলাম বলে সুসমতার কথা।

তেমনি উক্ত উত্থাপিত প্রশ্নের বিষয়টিও একটি সু সমতাপূর্ণ বিধান। এ বিধানটি শুধু অর্থনৈতিক লেনদেন সম্পর্কিত একটি বিশেষ প্রসঙ্গে এসেছে।

পবিত্র কুরআনে সেই আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

“যদি দুইজন পুরুষ সাক্ষী না পাও, তবে একজন পুরুষ ও দুইজন নারী সাক্ষী রাখো; যাতে একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।” [১২]

এই আয়াতটি কোনো সাধারণ বিষয় বা অপরাধের সাক্ষ্য নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লেনদেন (دَيْن / ঋণ) সংক্রান্ত চুক্তির প্রমাণ বিষয়ে নাযিল হয়।

এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার সময় (১৪০০ বছর আগে) আরব সমাজে নারীরা সাধারণত ব্যবসা, দেনা-পাওনা, বা বাণিজ্যিক লেনদেনে অংশগ্রহণ করতেন না। তারা পরিবার, সন্তান, গৃহপরিচর্যা ও সমাজের ভেতরের ভূমিকা পালন করতেন।

সুতরাং, লেনদেনসংক্রান্ত জটিল নথি বা চুক্তি তাদের কাছে অপরিচিত ছিল। এজন্য আল্লাহ তাআলা অত্যন্ত করুণাভরে বলেছেন —

“যেন একজন ভুলে গেলে অন্যজন তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে।”—এটা কোনো হীনতা নয়, বরং সাহায্য ও সহযোগিতার একটি সুন্দর ব্যবস্থা।

এছাড়া ইসলামের অন্যান্য বিষয়ে নারী ও পুরুষের সাক্ষ্য সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। যেমন -

➩ অপরাধ ও ন্যায়বিচারে :

কুরআনে বা সহিহ হাদীসে কোথাও বলা হয়নি যে অপরাধমূলক মামলায় নারীর সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য। বরং “ন্যায় প্রতিষ্ঠা”র দিকেই জোর দেওয়া হয়েছে।

"হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারের সাক্ষী হয়ে আল্লাহর জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও..." [১৩]

এখানে নারী–পুরুষের পার্থক্য করা হয়নি।

➩ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে :

হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আয়েশা (রা) ও অন্যান্য সাহাবিয়ারা (রা) বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা উম্মাহ এককভাবে গ্রহণ করেছে। যদি নারীর সাক্ষ্য অর্ধেক হতো, তবে তাদের বর্ণিত হাদীস অর্ধেক গণ্য হতো — অথচ তা হয়নি। এটাই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ ন্যায় বিচারের প্রমাণ।

কুরআনের উক্ত আয়াত নারী-পুরুষের মাঝে কোনো মূল্যনির্ধারণের ঘোষণা নয়, বরং একটি ব্যবহারিক বাস্তবতার নির্দেশনা — যাতে ন্যায়বিচার আরও নির্ভুলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলাম নারী ও পুরুষকে তাদের দায়িত্ব, অভিজ্ঞতা ও সামাজিক ভূমিকার ভিন্নতা অনুযায়ীই সাক্ষ্যের শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে, এটা মর্যাদাহানির নয়, বরং দায়িত্ববণ্টনের প্রজ্ঞাপূর্ণ উদাহরণ।

➤প্রশ্ন - ০৬ : নারী কি পুরুষের অধীন?

উত্তর:

ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে নারী-পুরুষের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তৃত্বের পার্থক্য দিয়েছে, তবে এই পার্থক্য মর্যাদায় নয়।

ইসলাম কি বলছে আসুন জেনে নেয়া যাক— ইসলাম বলছে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক।

আল্লাহ তাআলা বলেন —

"তারা (নারী-পুরুষ) একে অপরের পোশাক।" [১৪]

অর্থাৎ পোশাক যেমন দেহকে আবৃত করে, রক্ষা করে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, ঠিক তেমনি নারী ও পুরুষও একে অপরের জন্য সান্ত্বনা, নিরাপত্তা ও পরিপূর্ণতার উৎস। অর্থাৎ, একজন আরেকজনের অধীন নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক (Complementary)।

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন —

"পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক, কারণ আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং তারা তাদের সম্পদ ব্যয় করে থাকে।" [১৫]

এ আয়াতের “কাওয়ামুন” (قَوَّامُونَ) শব্দের মানে হলো — দায়িত্বশীল, রক্ষণাবেক্ষণকারী, অভিভাবক — শাসক বা প্রভু নয়। অর্থাৎ, পুরুষকে পরিবারের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে,
যাতে পরিবারে বিশৃঙ্খলা না ঘটে, দায়িত্বের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং সে নারীকে রক্ষা করতে পারে।

আমরা এর আগেও জেনেছি ইসলামে নেতৃত্ব মানেই শ্রেষ্ঠত্ব নয়, বরং দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।

রাসূল ﷺ বলেন —

"তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল, এবং প্রত্যেকের কাছ থেকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি নেওয়া হবে..." [১৬]

একই সাথে রাসূল ﷺ এই উম্মাহর পুরুষদের এও জানিয়ে দিচ্ছেন যে -

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে-ই, যে তার স্ত্রীর সাথে সর্বোত্তম আচরণ করে।” [১৭]

ইসলাম নারীর দায়িত্ব এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছে এই আয়াতগুলো তার উজ্জ্বল প্রমাণ।

নিঃসন্দেহে ইসলাম হলো সেই পথ যা ন্যায়, সততা ও পরিপূর্ণ ভারসাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলামই একমাত্র সত্য দ্বীন। তাই কেউ যদি দাবি করে সে আপনাকে ইসলামের থেকে অধিক ন্যায় কিংবা ভারসাম্য দিতে সক্ষম, তাহলে বুঝতে হবে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যাবাদী।

আজকের নারীবাদী কিংবা ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের নারী-নীতি বিচার করে নিজেদের সাংস্কৃতিক চশমা পরে। অথচ ইসলাম নারীকে এমন সম্মান, নিরাপত্তা ও আত্মমর্যাদা দিয়েছে যা পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম-দর্শন দিতে পারেনি।

আজকের নারীবাদ আসলে এক নতুন দাসত্ব — দেহের দাসত্ব, অশ্লীলতা ও বেহায়াপনার দাসত্ব। আর ইসলাম নারীকে দিয়েছে প্রকৃত ভারসাম্য এবং তার আসল স্বাধীনতা — আল্লাহর আনুগত্যে প্রশান্ত জীবন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

“যে ব্যক্তি সৎকর্ম করে — সে পুরুষ হোক বা নারী — এবং যদি সে ঈমানদার হয়, তবে আমরা তাকে অবশ্যই সুন্দর জীবন দান করব।” [১৮]

—

রেফারেন্স :

[১] Edward W. Said. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978

[২] সূরা আহযাব ৩৩:৫৯

[৩] (মুসনাদ আহমদ, ১৬৬১)

[৪] (সূরা নূর ২৪:৩০)

[৫] সূরা আন-নূর ২৪:৩১

[৬] সূরা আল-আহযাব ৩৩:৫৯

[৭] (সূরা নিসা ৪:৩৪)

[৮] (সহিহ বুখারী ৮৯৩)

[৯] (সূরা আন্-নিসা ৪:৩২)

[১০] (সূরা নিসা ৪:৩)

[১১] (আবু দাউদ ২১৩৩, তিরমিযি ১১৪১)

[১২] (সূরা বাকারা ২:২৮২)

[১৩] (সূরা আন্-নিসা ৪:১৩৫)

[১৪] (সূরা আল-বাকারা ২:১৮৭)

[১৫] (সূরা আন-নিসা ৪:৩৪)

[১৬] (সহীহ বুখারী ৮৯৩, সহীহ মুসলিম ১৮২৯)

[১৭] (তিরমিযী, ৩৮৯৫)

[১৮] (সূরা নাহল ১৬:৯৭)

—

❑ অধ্যায় - ০৯ : ইসলামে বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্বদের অবদান

এই অধ্যায়ে আমরা উম্মাহর সেই শ্রেষ্ঠ নারীদের ব্যাপারে জানার চেষ্টা করব। যাদের মাধ্যমে আমরা ইতিহাস, বাস্তবতা ও মুসলিম নারীর হারানো আত্মপরিচয় খুঁজে দেখার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ—

আজ আমরা এমন এক সময়ে দাঁড়িয়ে আছি, যখন "নারীর অধিকার" আর "নারীর স্বাধীনতা" কথাটা শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে পশ্চিমা সভ্যতার তৈরি করা কিছু স্লোগান। যেন নারীর সম্মান, উন্নতি বা স্বাধীনতার সব পথই পশ্চিমা চিন্তাধারা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক সত্য হলো— যে ধর্মটি নারীর জীবনে প্রথমবারের মতো প্রকৃত মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পরিচয় এনে দিয়েছিল, সেই ইসলামকেই আজ অনেকে ভুলভাবে বিচার করছে।

আরো দুঃখের বিষয় হলো—
মুসলিম নারীর যে সমৃদ্ধ ইতিহাস, যে অনন্য নারীদের কাহিনি, সেখান থেকেই আজকের অনেক মুসলিমাহ দূরে সরে যাচ্ছে। নিজের পরিচয় খুঁজতে পশ্চিমা বই, আন্দোলন বা ট্রেন্ডের দরজায় কড়া নাড়ছে; অথচ তার নিজের উম্মাহর ইতিহাসেই রয়েছে নারীর প্রকৃত স্বাধীনতার, শক্তির, মর্যাদার সবচেয়ে উজ্জ্বল উদাহরণ।

❑ ১. খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ (রাযি.) — ত্যাগ ও মর্যাদার প্রতীক

খাদিজা (রাযি.) শুধু ধনী ছিলেন না; তিনি ছিলেন মক্কার সবচেয়ে সম্মানিত মহিলা উদ্যোক্তা, বুদ্ধিমতী ও স্বনির্ভর নারীদের একজন। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সৌন্দর্য ব্যবসার সাফল্যে নয়, বরং কীভাবে তিনি নিজের সবটুকু নিয়ে স্বামী রাসূল ﷺ–এর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই জায়গায়।

নবুয়তের প্রথম সময়টিকে কল্পনা করুন—
পুরো এক পৃথিবী নবী ﷺ–কে অস্বীকার করছে, তাঁর কাছের মানুষরাও তাঁর দিকে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। এমনকি রাসূল ﷺ নিজেও ক্ষতির আশঙ্কা করছিলেন ঠিক সেই কঠিন মুহূর্তে নির্ভরতার একটিই স্থান— খাদিজা (রাযি.)।

সেসময় খাদিজা (রাযি.) রাসূল ﷺ কে অভয় দিয়ে বলেছিলেন,
"আল্লাহর কসম, কখনোই নয়। আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সদাচরণ করেন, অসহায় দুস্থদের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে

সহযোগিতা করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং হক পথের দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন।” [১]

খাদিজা (রাযি.) এর এইটুকু সান্ত্বনা নবীর হৃদয়ে এমন শক্তি দিয়েছিল যা কোনো সম্পদ ছুঁতে পারে না।

তাইতো তিনি চলে যাওয়ার পরও তাঁর প্রশংসায় রাসূল ﷺ নিজেই বলেছেন—

“খাদিজা আমার প্রতি বিশ্বাস রেখেছিলেন যখন সবাই অবিশ্বাস করেছিল।” [২]

আজকের পৃথিবীতে অনেক নারী “স্বামীর খিদমত” শব্দটা শুনলেই মনে করে নিজের সম্মান কমে যায়। কিন্তু খাদিজা (রাযি.) দেখিয়েছেন— স্বামীর খেদমত মানে অধীন হওয়া নয়; বরং সেটা এক বিশ্বাসী নারীর শক্তি, আনুগত্য, বিবেক ও পরিপক্বতার নিদর্শন।

হেরা গুহায় নবী ﷺ-কে খাবার পৌঁছে দেওয়া হোক, কিংবা দাওয়াহর শুরুতে পুরো সম্পদ বিলিয়ে দেওয়া হোক— সবটাই তিনি করেছিলেন ভালোবাসা ও ঈমানের দায় থেকে।

এ কারণেই আসমানের মালিক তাঁর সম্মান নিজেই ঘোষণা করেছেন। একদিন জিবরাইল (আ.) নবি ﷺ-এর কাছে এসে বললেন—

“হে আল্লাহর রাসূল! খাদিজার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছে দিন। আর তাঁকে জান্নাতে এক মুক্তোর তৈরি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে কোনো কষ্ট বা শব্দ-শোরগোল থাকবে না।” [৩]

এটি এমন এক সম্মান যে সম্মান পৃথিবীর কোনো নারী আন্দোলন কোনো নারীর জন্য এনে দিতে পারে না।

❑ ২. আয়িশা বিনতে আবি বকর (রাযি.) — জ্ঞানের আলো

আজকের যুগের আধুনিকমনা নারীবাদীর দাবি— ইসলাম নাকি নারীর শিক্ষার বিরোধী। অথচ আমাদের আম্মাজান হযরত আয়িশা (রাযি.)-এর জীবনই সেই মিথ্যা ধারণাকে ভেঙে দেয়।

তিনি শুধু নবী ﷺ-এর স্ত্রী ছিলেন না—বরং তিনি ছিলেন এই উম্মাহর প্রথম নারী আলিমা, হাদীস ও ফিকহের শিক্ষক, জ্ঞানপ্রেমী সাহাবিদের পরামর্শদাতা।

প্রায় ২,২০০-এর বেশি হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন—এরকম অর্জন পৃথিবীর কোনো সমাজে কোনো নারীর ছিল না।

তার ঘরই ছিল নারীদের প্রথম শিক্ষালয়, যেখানে সাহাবিয়ারা এসে শিখতেন কোরআন, হাদীস, ফিকহ ও আদব।

তাঁর ব্যাপারে ইমাম যুহরি বলেন—
"যদি আয়িশা (রাযি.)-র জ্ঞানকে অন্যান্য নারীদের জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে আয়িশার জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হবে।" [৪]

আজকের নারী উচ্চশিক্ষার দাবি তোলে, একের পর এক দুনিয়াবি ডিগ্রি নেয়, কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে তার জ্ঞান তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? আল্লাহর দিকে, নাকি দুনিয়ার দাবি-দাওয়ার দিকে?

আয়িশা (রাযি.) দেখিয়ে দিয়েছেন— জ্ঞান যখন উদ্দেশ্যহীন হয়, তখন তা আলো নয় পথভ্রষ্টতার কারণ হয়; আর জ্ঞান যখন ঈমানের সাথে মিশে যায়, তখন তা এক পুরো সভ্যতা বদলে দিতে সক্ষম হয়।

❑ ৩. ফাতিমা (রাযি.) — তাকওয়ায় পরিপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি

ফাতিমা (রাযি.)-এর জীবনকে যদি কল্পনায় দেখা যায়, তাহলে প্রথমেই চোখে ভেসে ওঠে এক সরল, শান্ত, আলোকিত ঘর—যেখানে সামান্য জিনিসপত্র, কিন্তু হৃদয়ে অসীম প্রশান্তি।

তিনি রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তাঁর জীবন ছিল নির্ঝঞ্ঝাট আরামদায়ক। বরং দাওয়াহর কঠিনতম সময়ে ক্ষুধা, পরিশ্রম ও দুঃখ—সবই ছিল তাঁর জীবনের নিত্য সঙ্গী।

তিনি নিজ হাতে ঘরের এত কাজ করতেন যে হাতের তালু শক্ত হয়ে যেতো, গুঁড়ো পাথরে আটা পিষে পিষে আঙুলে ক্ষত তৈরি হতো।

এরকমই এক দিনে তিনি নিজ পিতা রাসূল ﷺ-এর কাছে গিয়ে সাহায্যের কথা বলেছিলেন, কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে দিয়েছিলেন এমন কিছু—যা দুনিয়ার আরামের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ।

হাদিসে এসেছে—
"নবী ﷺ তখন তাঁকে শিখালেন ঘুমানোর আগে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলার যিকর।" [৫]

যিকর তাঁর ক্লান্তি দূর করল; আর হৃদয়ে এনে দিলো এমন শান্তি, যা কোনো দুনিয়াবি আরামে পাওয়া যায় না।

ফাতিমা (রাযি.) কম পেতেন, কিন্তু তার হৃদয় ছিল কানায় কানায় ভরা—আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি দিয়ে। তিনি কখনোই দুঃখ কষ্ট ভরা এ জীবনের জন্য নিজ স্বামীর কাছে অভিযোগ জানাতেন না। তার তাকওয়াই ছিল তার শক্তি তার সৌন্দর্য।

নবী ﷺ তাঁকে ভালোবেসে বলেছিলেন—
"ফাতিমা আমার অংশ; যে তাকে কষ্ট দেয়, সে আমাকে কষ্ট দেয়।" [৬]

আর তিনি তাঁর সম্পর্কে আরও বলেছেন—
"ফাতিমা জান্নাতি নারীদের সর্দার।" [৭]

আজকের যুগে নারীদের জন্য যেখানে সুখ মানেই আরাম-আয়েশ, ফাতিমা (রাযি.) সেখানে দেখিয়ে গেছেন—আল্লাহর প্রতি ভরসা, সন্তুষ্টি ও বিনয়—
এই তিনেই লুকিয়ে আছে নারীর প্রকৃত মর্যাদা।

❑ 8. উম্মে আম্মারা (রাযি.) — ঈমানের অগ্নিপরীক্ষায় দাঁড়ানো সাহসী নারী

উহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আকাশ ধুলো ও তীরের শব্দে ভারী হয়ে উঠছিল— সেই মুহূর্তে এক নারী এগিয়ে এলেন। হাতে পানি দেওয়ার পাত্র নিয়ে নয়; নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে শত্রু সম্মুখে প্রিয় রাসূলকে বাঁচানোর জন্য।

তিনিই এই উম্মাহর প্রকৃত শক্তিশালী সাহসী একজন নারী "উম্মে আম্মারা (নুসাইবা বিনতে কা'ব রাযি.)"।

তিনি মূলত সেসময় যুদ্ধ করতে আসেননি, এসেছিলেন আহত সাহাবিদের পানি দিতে। কিন্তু যখন দেখলেন নবী ﷺ-কে আক্রমণকারীরা ঘিরে ধরছে— তিনি দ্বিধা না করে তলোয়ার তুলে দাঁড়িয়ে গেলেন নবীর সামনে।

তাঁর শরীরে এক-দু'টি নয়— বারোটি গভীর ক্ষত হয়েছিল যুদ্ধের মাঝে, তবুও তিনি ফিরেও তাকাননি। তিনি শুধু নবী ﷺ-কে রক্ষা করছিলেন নিজের জীবনকে ঢাল বানিয়ে।

রাসূল ﷺ পরে তাঁর কথা স্মরণ করে বলেছিলেন—
"উহুদের যুদ্ধে আমি যেদিকে তাকাই, আমি উম্মে আম্মারাকে আমাকে রক্ষা করতে দেখি।" [৮]

আরেক বর্ণনায় আসে—
তাঁর কাঁধ থেকে এমন একটি বড় ক্ষত হয়ে গিয়েছিল যা বছরের পর বছর দাগ হয়ে থেকেছিল। [৯]

যুদ্ধ শেষে রাসূল ﷺ তার সাহস দেখে বললেন—
"তুমি যে আজ যা করেছ, তার চেয়ে উত্তম কোনো অবস্থান আছে?" [১০]

আজকের দুনিয়ায় আমরা নারীর সাহস মাপি কণ্ঠের জোর বা রাস্তায় অবস্থানে। পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার ভিত্তিতে। বড় বড় ডিগ্রী অর্জন কিংবা রাস্তার বিলবোর্ডে নিজেকে নগ্ন ভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে। কিন্তু উম্মে আম্মারা (রাযি.)—
প্রমাণ করেছেন সাহসের আসল মাপকাঠি শব্দ নয়— বরং ঈমানের প্রতি অটলতা।

তাঁর জীবন বলছে— নারীর শক্তি তার পর্দায়, তার বিনয়ে, এবং তার ঈমানের দৃঢ়তায়।

উম্মাহর নারীদের এই "ইমান—আমল—ইখলাস—বীরত্ব" বলে মুসলিম নারীর শক্তি পশ্চিমে নয় বরং তার নিজস্ব মুসলিম ইতিহাসে তার দ্বীনে।

ইসলামের নারীরা কোনো বিশেষ যুগের একটি নিছক গল্প নয়; তারা প্রতিটি যুগের জন্য দিকনির্দেশনা।

পশ্চিমা স্বাধীনতা নারীর স্বাবলম্বীতার নামে নারীকে একা করে দিয়েছে, আর ইসলাম তাকে পরিবার, সম্মান ও আত্মিক শক্তির কেন্দ্রবিন্দু বানিয়েছে।

আল্লাহ বলেন—
“মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী— তারা পরস্পরের সহায়ক।” [১১]

একজন মুসলিম নারীর শক্তি দুনিয়ার নকল স্বাধীনতায় নয়—তার শক্তি নিহিত তার ঈমান, তার চরিত্র, তার ত্যাগ, এবং তার ভূমিকার সচেতনতায়।

একজন মুসলিম নারী যখন নিজের পরিচয় খুঁজে পেতে এই নারীদের দিকে তাকায়— তখন তিনি বুঝতে পারেন— ইসলাম কখনো নারীর পথ রোধ করেনি; বরং তাকে সেই উচ্চতায় উত্তোলন করেছে, যেখানে পৌঁছানো অন্য কোনো সভ্যতার পক্ষে সম্ভব নয়।

—-

রেফারেন্স

[১] (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৩)।
[২] (সহীহ আল-জামি, হাদীস ৩৩১১, শাইখ আলবানী সহীহ বলেছেন)
[৩] সহীহ বুখারি, হাদীস ৩৮২০ / সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৪৩২
[৪] (আল-ইস্তিযকার, ইবন আব্দুল বার)
[৫] (সহীহ বুখারি, হাদীস ৩১১৩)
[৬] (সহীহ বুখারি, হাদীস ৩৭১৪)
[৭] (সহীহ আল-জামি, হাদীস ৩৯৫৩, সহীহ বলেছেন আলবানী)
[৮] (ইবন হিশাম, সীরাতুন্নবী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৬৪)
[৯] (ইবন সাদ, আত-তাবাকাত, খণ্ড ৮)
[১০] (ইবন কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, খণ্ড ৪)
[১১] (সূরা আত-তাওবাহ্ : ৭১)

—

❑ অধ্যায় - ১০ : ২১-শতকের মুসলিমাহ: হীনমন্যতা কাটিয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জনের পথ

এই অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে—২১-শতকের মুসলিমাহ কীভাবে আধুনিকতার চাপ, পরিচয় সংকট ও মানসিক হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে নিজের প্রকৃত পরিচয়, মর্যাদা ও শক্তি পুনরুদ্ধার করতে পারে। কুরআন-হাদীস, শ্রেষ্ঠ মুসলিম নারীদের আদর্শ এবং দায়িত্বভিত্তিক জীবনবোধের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—একজন মুসলিমাহ কীভাবে আত্মবিশ্বাসী, সচেতন, দায়িত্বশীল ও উম্মাহ-নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখা নারী হিসেবে গড়ে উঠবে।

—

বর্তমানে আমরা অবস্থান করছি ২১-শতকে। যে সময়টি তথ্যপ্রযুক্তি, ভোগবাদ, চাকচিক্য এবং মূল্যবোধহীন প্রতিযোগিতায় ভরা এক সময়। এই যুগে মুসলিম নারীর উপর চাপ আরও বহুমাত্রিক—সৌন্দর্যের কৃত্রিম মানদণ্ড, আধুনিকতার নামে পরিচয় সংকট, পরিবার কাঠামোর পরিবর্তন এবং ইসলামি জ্ঞানের অভাব। আর এসব কারণে অনেক মুসলিমাহ আজ নিজের প্রকৃত পরিচয় ভুলে গিয়ে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, মনের গভীরে জন্ম দিয়েছে হীনমন্যতার।

কিন্তু সত্য হলো— একজন মুসলিমাহ জন্মগতভাবেই সম্মানিত। তার মর্যাদা মানুষ দেয়নি, বরং তার মর্যাদা দিয়েছেন আল্লাহ নিজেই।

আল্লাহ বলেন:
“আমি আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি।” [১]

এখন প্রশ্ন হলো—
“কেমন হবে ২১-শতকের মুসলিমাহ?” তার পরিচয় কী? তার দায়িত্ব কী? কোন শক্তিতে সে আত্মবিশ্বাসী হবে?

এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হলো—ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি, কুরআন-হাদীসের রেফারেন্স এবং নবী ﷺ-এর যুগের নারীদের আদর্শ অনুসরণ করে—একজন আধুনিক দিনের মুসলিমাহ কীভাবে নিজের পরিচয় পুনর্গঠন করবে, আত্মসম্মান ফিরে পাবে এবং উম্মাহর জন্য উপকারী হবে।

১.❑ পরিচয়ের পুনর্নির্মাণ: সে ইসলামকে দ্বীন হিসেবে চিনবে, জানবে ও মানবে।

২১-শতকের মুসলিমাহ প্রথমেই বুঝবে—ইসলাম শুধুই একটি নিছক ধর্ম নয়, বরং ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা।

আল্লাহ বলেন—
“আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম।” [২]

যে নারী ইসলামকে টুকরো টুকরো করে নয়, পূর্ণভাবে গ্রহণ করে, সে কখনো পরিচয়ের সংকটে পড়ে না। তার আত্মবিশ্বাস আসে এখান থেকেই—

- ✔ “আমি আল্লাহর বান্দাহ।”
- ✔ “আমার জীবন আল্লাহ–রসূলের নির্দেশনায়।”
- ✔ “আমার মূল্য আল্লাহ নির্ধারিত।”

রাসূল ﷺ বলেছেন:
“আল্লাহ যাকে সম্মান দেন তাকে কেউ অপমান করতে পারে না।” [৩]

২.❑ সে মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নারীদের রোল মডেল হিসেবে গ্রহণ করবে।

মিডিয়া আজ নারীর পরিচয় তৈরি করছে— অলৌকিক সৌন্দর্য, দেহপ্রদর্শন, অর্থ-খ্যাতি—যা বাস্তব না, স্থায়ী না, সম্মানও না।

২১-শতকের মুসলিমাহ মিডিয়ার কৃত্রিম আইডলদের অনুসরণ করবে না। তার রোল মডেল হবে মুসলিম ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ নারীরা—

তার আইডল মেকআপ-ফিল্টারের নারীরা হতে পারে না; তার আইডল তারা—যাদের জীবনের আলো কিয়ামত পর্যন্ত জ্বলবে।

ইতিহাসের সেই মহান নারীরা:

- খাদিজা (রাযি.) — দৃঢ়তা, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ ও স্বামীর সহায়তায় আদর্শ।

● আয়েশা (রাযি.) — জ্ঞান, শিক্ষা ও ফিকহের আলো।

● ফাতিমা (রাযি.) — বিনয়, পরিবারের প্রতি নিবেদন এবং তাকওয়ার স্তরে উন্নীত।

● নুসাইবা (রাযি.) — দুঃসাহসি, রক্ষক, উহুদের অটল সৈনিক।

● মরিয়ম (আ.) — চরম পরীক্ষা ও তিরস্কারের মধ্যেও ঈমানের দৃঢ়তার পরিচয়।

এই রোল মডেলদের অনুসরণই আজকের মুসলিম নারীর অন্তরে যোগাবে সাহস যোগাবে আত্মবিশ্বাস।

৩.❑ মুসলিমাহর প্রধান মিশন: তার ঘর কেন্দ্রিক।

"আমাদের বোনদের আসল কাজ তাদের ঘরে"—অনেকে ভাবে— "নারী শুধু ঘরে থাকবে?"
কিন্তু বাস্তবতা হলো—ঘর কোনো সীমাবদ্ধতা নয়; ঘর হলো মুসলিমাহর রাষ্ট্র নির্মাণের ফ্যাক্টরি।

একজন মা গড়ে তোলে একটি সভ্য জাতিকে। তার কোলে জন্ম নেয়— আবু বকর, উমর, সালাহউদ্দীন আইয়ুবী, মুহাম্মদ ফাতিহ!

রাসূল ﷺ বলেছেন:
"নারী হলো তার স্বামীর ঘরের রক্ষক এবং সে তার উপর দায়িত্বশীল।" [৪]

এ দায়িত্ব মানে—
- পরিবারকে ঈমানে গড়া
- সন্তানকে বিশুদ্ধ আকিদায় শক্ত করা
- ঘরকে নৈতিকতার কেন্দ্র বানানো

যে নারী তার ঘরকে দাওয়াহ কেন্দ্র বানায়—সে পুরো জাতিকে বদলে দিতে পারে ইন শা আল্লাহ। ২১-শতকের মুসলিমাহ জানবে—তার কোলে গড়া সন্তানই হবে আগামী দিনের নেতা, দাঈ, আলেম, চিন্তাবিদ ইন শা আল্লাহ।

৪.❑ নিজ গন্ডিতে থেকে উম্মাহর ব্যাপারে ফিকির:

২১-শতকের মুসলিমাহ শুধু নিজের রুটিন, জীবন, সৌন্দর্য বা ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত নারী হবে না। সে হবে সেই নারী যে—

- উম্মাহর দুঃখে কাঁদে
- অন্য বোনদের ইমানের জন্য চিন্তা করে
- বোনদের মাঝে শক্ত দাওয়াহ নেটওয়ার্ক তৈরি করে

রাসূল ﷺ বলেন:
“তোমরা যদি একে অপরকে না ভালোবাসো—ইমান পূর্ণ হবে না।” [৫]

৫.❑ আত্মবিশ্বাসের মূল: নিজের আল্লাহপ্রদত্ত মর্যাদা উপলব্ধি

আল্লাহ নারীর মর্যাদা নিজ হাতে স্থির করেছেন। ২১-শতকের মুসলিমাহ নিজের সেই মর্যাদা চিনে নিবে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন -

✔ “তিনি তাঁর রুহ থেকে ফুঁকে দিয়েছেন।” [৬]

✔ “তিনি তোমাদের মধ্যে নারী-পুরুষের সম্মান এক করেছেন।” [৭]

✔ “নেক আমলকারী নারী-পুরুষ সমান প্রতিদান পাবে।” [৮]

যে নারী জানে—
- তার আমল আল্লাহ দেখছেন
- তার পরিশ্রম বৃথা যাবে না
- তার প্রতিটি কষ্টে সওয়াব লেখা হচ্ছে
- তার ভবিষ্যৎ আল্লাহর হাতে

সে নারী কখনো হীনমন্য হয় না।

২১-শতকের মুসলিমাহ চ্যালেঞ্জের সময়ে জন্মেছে। কিন্তু তার ঈমান, তার ইতিহাস, তার পরিচয়—এসবই তাকে করে শক্তিশালী।

যখন সে—
✓ ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করবে
✓ মহান নারীদের অনুসরণ করবে
✓ ঘরকে উম্মাহ গঠনের কেন্দ্র বানাবে
✓ দাওয়াহর শক্ত নেটওয়ার্ক তৈরি করবে
✓ তার ঈমানকে জ্ঞান দিয়ে শক্ত করবে

তখন সে হয়ে উঠবে— মরিয়মের ইমান, খাদিজার দৃঢ়তা, আয়েশার জ্ঞান, ফাতিমার তাকওয়া, নুসাইবার সাহস— সব মিলিয়ে এক শক্তিশালী ২১-শতকের মুসলিমাহ।

মুসলিম নারীর হীনমন্যতার কারণ অনেক, কিন্তু তার সমাধান একটাই—আল্লাহর দেয়া মর্যাদাকে উপলব্ধি করা। এটাই তার প্রকৃত পরিচয়।
এটাই তার আত্মবিশ্বাসের উৎস। এটাই তার হীনমন্যতার শেষ।

—

রেফারেন্স

[১] (সূরা আল-ইসরা ৭০)
[২] (সূরা আল-মায়িদাহ ৩)
[৩] (তিরমিজি(
[৪] (বুখারী, মুসলিম)
[৫] (মুসলিম)
[৬] (সূরা সাজদাহ ৯)
[৭] (সূরা হুজুরাত ১৩)
[৮] (সূরা নাহল ৯৭)

—